শুক্লপক্ষ

শুক্লপক্ষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেলা দেড়টায় রান্নাঘরের পাট চুকল। কিন্তু বিশ্রামের জন্তে আজ আর মেঝেয় মাদুর পেতে একটু গড়িয়ে নিলেন না রেণুকণা। ছোট ছেলে সুদেবের রুল-টানা খাতার খান দুই পাতা ছিঁড়ে দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

সারা বাড়ি প্রায় নিঃঝুম। উঠানে বৈশাখের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। দিন কয়েক ঝড়-বৃষ্টির পরে বেশ কড়া রোদ উঠেছে আজ। স্বামী সুখময় বহু দিন আগে ছাতাটি হারিয়ে ফেলেছেন। আজ এই রোদের মধ্যে বিনা ছাতায় বেরিয়েছেন দোকানের কাজে। রেণুকণা এত করে বলেছেন, 'সস্তার মধ্যে একটা ছাতা তাড়াতাড়ি কিনে নাও। এখন তো বৃষ্টি-বাদলা রোজই হবে।'

কিন্তু সুখময় সে কথায় কান দেন নি। বলেছেন, 'হ্যাঁ, ছাতা কেনা অত সোজা কি না। সাত-আট টাকার কমে একটা ছাতা হয় না আজকাল। তা ছাড়া আজ কিনব, দু দিন বাদে আবার চুরি যাবে। তার চেয়ে এবার আর ছাতা কিনবই না সেবার মা। দেখি, শালার চোর আমার কি চুরি করে!'

স্বামীর কথা শুনলে রেণুকণার হাসিও পায়, রাগও হয়। চিরকাল একই রকমের জেদী আর গোঁয়ার রয়ে গেল মানুষটি। বোকা মানুষের জেদ। যদি বুদ্ধিমান মানুষের জেদ হত তা সংসারের কাজে লাগত। কিন্তু চিরকাল কি মানুষের এক রকম গোঁ থাকা ভাল! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের যদি বুদ্ধিশুদ্ধি ধৈর্য-টৈর্য না বাড়ে তা হলে তার

দুঃখের শেষ থাকে না। আর তার সঙ্গে বাড়িসুদ্ধ মানুষ কষ্ট পায়। সুখময়ের এখন কি আর আগের সেই বয়স আর রক্তের জোর আছে! ষাট অবশ্য এখনও হয় নি। কিন্তু পঞ্চান্ন-ছাপান্ন তো হয়েছে বয়স। এখন কি আর অত গোঁয়ারতুমি শরীরে সয়! ছাতা উনি কিনবেন না, ওই টাক-মাথা নিয়ে এই রোদের মধ্যে রোজ তিন-চার মাইল পথ হাঁটবেন কি করে! স্বামীর টাকের কথা মনে পড়ায় একটু হাসি পেল রেণুকণার। সত্যি, কি চেহারা হয়েছে একখানা! যেমন টাকু, তেমনি ভুঁড়ি। এই দুটো জিনিসই রেণুর দু চোখের বিষ ছিল। এখন দেখে দেখে সয়ে গেছে। জীবনে না সয় কী!

স্বামীর ভাবনা ছেড়ে ফের চিঠিতে মন দিলেন রেণুকণা। ভাবতে গেলে আর লেখা হবে না। উত্তর দিকের জানালার কাছে বসে কোলের ওপর একখানা মোটা বাঁধানো বই রেখে রুলটানা কাগজে তিনি ফের লেখার উদ্যোগ করলেন। ছোট ছেলে মেয়ে দুটি স্কুলে গেছে। শাশুড়ী খেয়ে-দেয়ে পুবের ঘরে ঘুমাচ্ছেন। আর তাঁর বড় নাতনীটির চোখে ঘুম নেই। সে ভিজে চুল ছেড়ে দিয়ে বারান্দার তক্তপোশে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশ বুকে চেপে নবেল পড়ছে। মেয়েটার রকম-সকম দেখলে রাগ হয় রেণুকণার। এর চেয়ে যদি দুটো সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে তা হলেও সংসারের অনেক উপকার হয়। রাশ রাশ ওই সব ছাইপাঁশ পড়ে কী যে সুখ পায় তা মেয়েই জানে। সুখ! হঠাৎ রেণুকণার মন একটু কোমল হয়ে উঠল। আহা, ও মেয়ের ভাগ্যে সুখ কি কোনদিন আর হবে! কোনদিন কি বিয়ে-থা দিতে পারবেন ওর! সেবারও স্বামী হবে, সন্তান হবে, নিজের ঘর-সংসার হবে কোনদিন!

যা ঘটে গেছে তারপর তেমন আশা রেণুকণা আর করেন না। বইপত্র নিয়ে মেয়েটা যদি একটু শান্তিতে থাকে থাকুক। পাড়ায় তো কোথাও বড় একটা বেরোয় না। বাইরের জনমনুষ্যের মুখ তো আর দেখে না কোথাও গিয়ে। চিঠি লিখতে বসলেই যত রাজ্যের ভাবনা আসে। রেণুকণা মন ঠিক করে আবার শক্ত করে কলম ধরলেন, তারপর নিবিষ্ট ভাবে চিঠিখানা লিখে চললেন :

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

চণ্ডীপুর, ১২ই বৈশাখ
১৩৫৭ সাল।

শ্রীচরণকমলেষু

বড় দাদা, প্রণাম অন্তে সেবিকার নিবেদন—অনেক দিন হইল আপনার চিঠি পত্র পাই না। বউদিকে দুই দুই খানা চিঠি লিখলাম। তিনিও কোন উত্তর দিলেন না। বার ২ সেবার কথা লিখি বলিয়া বোধ করি বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু বড় দাদা দুঃখের কথা আপনাদের জানাইব না তো আর কাদের জানাইব। যেমন করিয়াই হোক হতভাগিনী মেয়েটার ব্যেবস্থা আপনাকে করে দিতেই হইবে। আপনারা ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই।

মেয়ের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা তো হইয়াছে। এখন আমার মরা জ্বালা। ওকে ঘরে রাখিয়াই বা কি করিব। সেবার ইচ্ছা কলিকাতায় যায়। সেখানে হয় পড়াশুনা না হয় চাকবি বাকরি একটা কিছু করে। কলকাতায় আপনারা ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নাই, আত্মীয়বান্ধবও নাই। আপনারা যদি দয়া করেন তবেই মেয়েটার গতি হয়। আমি বউদির মুখ চাহিয়া আছি। তাঁকে বলিবেন আমি কোন অন্যায্য আবদার করিব না। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা বলিব না। শুধু ও যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে আপনারা সকলে মিলিয়া তার একটা ব্যেবস্থা করিয়া দিন। তার পর ওর ভাগ্যে যাহা আছে হইবে। শুনিয়াছি কলিকাতায় অনেক আশ্রম টাশ্রম আছে। কিন্তু সেবাকে কোন আশ্রমে দিতে আমার মন সরে না বড় দাদা। আমার ভাগ্য মন্দ। চূণ খেয়ে মুখ পোড়ে দই দেখে ভয় করে। আমার সেই অবস্থা। অচেনা অজানা জায়গায় গিয়েও মেয়ে আবার কোন বিপদ ঘটাইয়া বসিবে তার ঠিক কি। ওকে আপনার কাছে রাখিয়া যেমন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব আর কারো কাছে দিয়া তেমন পারিব না। আপনাকে সব খুলিয়া লিখিলাম। এখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন।

আপনার ভগ্নীপতির শরীর ভাল না। মেয়ের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁর মনে শান্তি নাই। সংসারে অভাব অনটন তো লাগিয়াই আছে।

বউদি কেমন আছেন। কতকাল ধরিয়া তাঁকে দেখি না। মাঝে মাঝে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে।

বীথি কেমন আছে। স্বামীর সঙ্গে ওর গোলমাল মিটিল কি না জানাইবেন। আপনি অগ্রসর হইয়া মিটমাট করিয়া দিবেন। সোয়ামী সন্তান ছাড়া মেয়েদের সুখ কই?

জয়ন্তকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন। শুনি সে তো কত জায়গায় যায় কত দেশ বিদেশ ঘোরে। একবার কী গবিব পিসীর কাছে আসিতে পারে না?

আমার তো ইচ্ছা করে ছুটিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু বড়দাদা আমার যে হাত পা বাঁধা। এই সংসার ফেলিয়া আমার কি নড়বার জো আছে? মরবার আগে এরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।

আপনার চিঠির আশায় রহিলাম। গবীব বোনকে নিরাশ করিবেন না। আপনারা ছাড়া আমাব আর কেউ নাই।

ভগবানের কৃপায় আমরা কুশলে আছি। আপনাদের কুশল জানাইবেন।

আপনি ও বউদি আমাব ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন। বীথি আর জয়ন্তকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন।

ইতি আপনার স্নেহের বোন রেণু।

অনেক ভেবে ভেবে, অনেক কাটাকুটির পর চিঠিখানা শেষ করলেন রেণুকণা। আবও অনেক কথা লেখার ছিল। সেবার কথা আর একটু গুছিয়ে লিখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু লিখতে বড় সময় লাগে, তা ছাড়া যা লিখতে চান তা যেন ঠিক ঠিক লেখা হয়ে ওঠে না। কতদিন স্বামীকে অনুরোধ করেছেন—লিখে দাও না চিঠিখানা। কিন্তু এ সব ব্যাপারে সুখময় আরও কুঁড়ে। কলম মোটে তাঁর ধরতে ইচ্ছা করে না। সেবাকে বলে বলেও হয়রান হয়ে গেছেন রেণুকণা। বলেছেন, 'তুই তো ম্যাট্রিক

পাস করেছিস। হাতের লেখাও তোর ভাল। দে না আমার চিঠিগুলি লিখে। নিজের জবানীতে তো নয়, আমার জবানীতেই লিখবি। তাতে লজ্জা কি ?'

কিন্তু মেয়ে তাতে মোটেই রাজী নয়। সে কেবলই বলে, 'মা, ও ধরনের চিঠি তো কত জনকেই লিখলে। তোমার বড়দাদা, মেজদাদা, ছোড়দাদা থেকে শুরু করে সোনাজ্যেঠা, রাঙামামা কাউকেই তো বাদ দাও নি। কই, কারও কাছ থেকে তো সাড়া পেলে না। কি হবে লিখে। মিছিমিছি ডাকখরচা বাড়ানো। বাবা ঠিকই বলেন, ওই পয়সাগুলো বাজারে ব্যয় করলে দুটো তরকারি বেশি আসে।'

মেয়েটা যে নেহাত মিথ্যে কথা বলে তা নয়। তবু হাত পা গুটিয়ে একেবারে চুপ করে বসে থাকতে মন চায় না রেণুকণার। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ থাকে। তারপর ফের নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ বেগে পত্রালাপ শুরু করেন। এ যেন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। স্বামীকে চিঠি লেখার তো কোন দরকার হয় না। তিনি আজ তিরিশ বছর ধরে কাছেই রয়েছেন। তবু রেণুকণার চিঠি লেখার বিরাম নেই। আত্মীয়স্বজন হয়েও যাঁরা খোঁজ খবর করেন না, যাঁদের সঙ্গে পনর-বিশ বছর ধরে হয়তো দেখাসাক্ষাৎ নেই, বাকি জীবনে কোনদিন হয়তো দেখা আর হবেও না, তাঁদের কাছেও মাঝে মাঝে এক-একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে বসেন রেণুকণা। অনেকেই জবাব দেন না, আবার কেউ কেউ হয়তো দেনও। তখন আনন্দের আর সীমা থাকে না তাঁর। পোস্ট অফিসের সীল-মারা চিঠি নিজের নামে এলে এখনও অল্পবয়সী মেয়ের মতই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রেণুকণা। আগে আগে সুখময় ঠাট্টা করতেন, 'কি ব্যাপার, প্রেমপত্তর-টত্তর এল নাকি ?'

রেণুকণা বলতেন, 'যাও, মুখে কিছুই আটকায় না তোমার। আমাকে প্রেমপত্র লিখবে কে ? যে লিখতে পারত সে দোকানে বসে জমা-খরচের খাতা লেখে।"

সেবার জন্যে চিঠি লেখার দরকার আরও বেড়েছে রেণুকণার। বিনা

চেষ্টায় বসে থেকে কি হবে? যেমন করেই হোক মেয়ের একটা গতি তো তাকে করে দিতেই হবে।' কি কথা মনে পড়ায় হঠাৎ রেণুকণা ডেকে উঠলেন, 'সেবা, সেবা!'

মার ডাক শুনে সেবা বারান্দা থেকে সাড়া দিয়ে বলল, 'কি বলছ মা?'

রেণুকণা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি বলছি এখানে এসে শুনে যা দিনভরই কি নবেল পড়বি, সংসারে আর কি কোন কাজকর্ম নেই?'

সেবা হেসে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীখানা বন্ধ করে তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল। 'দত্তা' বইটি পড়ছিল। বইখানা অবশ্য কয়েক বছর আগে আরও একবার পড়েছে। কিন্তু হাতের কাছে আর কিছু বই না থাকায় পড়া বই-ই ফের পড়তে শুরু করেছিল। বারান্দা থেকে ঘরে এসে ঢুকল সেবা। বলল, 'কি মা, অত ডাকাডাকি কবছিলে কেন?'

রেণুকণা মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। যতই রাগ করুন, ওর হাসি মুখখানা দেখতে ভালই লাগে। মেয়ে যে তাঁর সুন্দরী—এ কথা পরম শত্রুতেও অস্বীকার করে না। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ মাজা গৌর। পাতলা ঠোঁট। সমান দাঁতের সারি। ফুলের মত দেখতে। লম্বাটে মিষ্টি মুখের ডৌল। পাল চৌধুরীদের বড ছেলে বিমল কলকাতায় ডাক্তারি পডে। সে বছরকয়েক আগে প্রায়ই বলত, 'মামীমা, ওকে নাচ শেখান। ওর ঠিক নাচের ফিগার।' আর নাচ! ভগবান রেণুকণাকে যে নাচ নাচাচ্ছেন! তখন অবশ্য বয়স কম ছিল সেবার। দেখতেও এত বড় দেখাত না। কিন্তু এই তিন-চার বছরের মধ্যে গড়ন এমন বাড়ন্ত হয়েছে যে, আঠার-উনিশ বছরের মেয়েকে মনে হয় যেন বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী। রূপ আছে তাঁর মেয়ের। এত রূপই তো ওর কাল হল।

সেবা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছিলে কেন মা?'

রেণুকণা বললেন, 'বোস এখানে। পড়ে দেখ তো।' মায়ের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে সেবা খিলখিল করে হেসে উঠল।

রেণুকণা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কি জ্বালা! অমন করে হাসছিস যে?'

সেবা বলল, 'হাসব না ? দু পাতার চিঠি লিখতে গণ্ডা দুই ভুল করেছ। ক্রিয়াপদগুলি একবার সাধু আর একবার চলতি ! আর বানানের কি ছিরি !'

রেণুকণা একটু হেসে বললেন, 'তা বাপু তোমাদের পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও তো দু ছত্তর লিখে দেবে না। আমি যা পেরেছি লিখেছি। তোমাদের মত পাস পরীক্ষা দেওয়া পণ্ডিত তো আর নই।'

সেবা বলল, 'তাই বলে তুমি কুশল না লিখে কুশুল লিখবে কেন মা ? তোমাকে কতদিন বলেছি কথাটা কুশল। কুশুল বলে কোন শব্দই নেই ডিকশনারিতে। তবু ভুলটা তুমি শোধরাতে পারলে না। দাও তো কলমটা। আমি বানানগুলো ঠিক করে দিই।'

রেণুকণা কলমটা মেয়ের হাতে না দিয়ে নিজের মুঠিতে চেপে রাখলেন, বললেন, 'না বাপু, দরকার নেই তোমার আর মাস্টারি করে। আপন জনের কাছে লিখছি। ভুল লিখি শুদ্ধ লিখি যাঁরা বোঝবার তাঁরা ঠিক বুঝে নেবেন।'

সেবা মৃদু হেসে বলল, 'তবে থাক।'

আসলে বানান ভুলের কথা তুললে রেণুকণা ভারি অসন্তুষ্ট হন। রীতিমত অপমানিত বোধ করেন। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেবার বাবাও ঠাট্টা করতে ছাড়েন না। 'ওরে বাবা, উনি যা লিখবেন তার ওপর কি কলম ছোঁয়াবার জো আছে ! উনি হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র।'

সেবা বাবাকেও শুধরে দেয়, 'বরপুত্র নয় বাবা, বরপুত্রী।' রেণুকণা সুযোগ পেয়ে বলেন, 'কেবল আমাকে ঠাট্টা ! নিজে কত বিদ্যাদিগগজ !'

আসলে নিজের ভুলের কথা রেণুকণা যে না বোঝেন তা নয়। কিন্তু কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে। লেখার সময় কলমে যেখানে দীর্ঘ-ঈকার এসে পড়ে সেখানে হ্রস্ব-ইকার দিয়ে তেমন জুত হয় না। আর অল্প বয়স থেকে ব্যবহার করা কুশুল কথাটা রেণুকণার কাছে যত আপন, যত অর্থবহ, বিশুদ্ধ কুশল তত নয়। অনেক কুসংস্কার আর মুদ্রাদোষের মত বানান-ভুলগুলিকে নিজের অভ্যাস-আচরণের সঙ্গে মিশিয়ে বড় আপন করে নিয়েছেন রেণুকণা। সেগুলি শোধরাতে গেলে ব্যথা লাগে।

সেবা বলল, 'বেশ। থাকো তুমি। তোমার এই ভুল বায়নাগুলো নিয়ে। কিন্তু মা, এ সব চিঠি লিখে কি হবে বল তো? আমাদের জন্যে কেউ কিছু করবে না। কেন মানুষের কাছে মিছিমিছি মাথা নীচু করা!'

রেণুকণা বললেন, 'না করে কি করব তাই বল্? এই গাঁয়ে থেকে তোর বিয়ে আমরা কিছুতেই দিতে পারব না। কতবার তো চেষ্টা করে দেখলাম। সব সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পাড়ায় তো কুচক্রী মানুষের অভাব নেই। তারা নিশ্চয়ই ভাংচি দিয়েছে। কলকাতায় তোকে রাখতে পারলে একটা সুযোগ সুবিধে সেখানে হয়ে যেতেও পারে। শুনেছি কত বড় জায়গা। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান আর দয়ালু মানুষ আছেন সেখানে। কেউ কি একটা ব্যবস্থা করবেন না?'

মায়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেবার মিল নেই। জীবনে কোনদিন বিয়ে করবে না মনে মনে এ সঙ্কল্প ঠিকই আছে সেবার। বিয়ের কথা ভাবতে মনে তার এক অদ্ভুত আতঙ্ক আসে। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে। তবু সেবা এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে চায় না। এখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই, লেখাপড়ার আর কোন সুযোগ নেই, মেয়েদের কাজকর্ম, চাকরি-বাকরির কোন ব্যবস্থাই নেই এখানে। তাই সেবা এই চণ্ডীপুর ছেড়ে, দূরে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়, বাবা মা ঠাকুরমা ভাই বোনদের ছেড়ে থাকতে অবশ্য খুবই কষ্ট হবে সেবার। কিন্তু এখানে থেকেও তো কোন লাভ হবে না। না পারবে অভাবের সংসারে দু পয়সা সাহায্য করতে, না পারবে বাপ-মায়ের মনে একটু শান্তি দিতে। বরং চোখের সামনে সর্বদা থাকলে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা তাঁরা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। পাড়ার লোকই তাঁদের ভুলতে দেবে না। যেতে তো চায় সেবা। কিন্তু যাবে কোথায়। এত বড় পৃথিবীতে তার জন্যে কি কোথাও কোন জায়গা আছে? মনে তো হয় না। সেই দুর্ঘটনার পর সব মিলিয়ে মাস পাঁচ-ছয় অবশ্য বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছে সেবা। শিলিগুড়িতে দূর সম্পর্কের এক কাকার কাছে ছিল মাস দুই। কিন্তু কাকিমা তার পর আর রাখতে চাইলেন না। বালুরঘাটে মাসতুতো

ভাইয়ের আশ্রয়ে কিছুদিন কেটেছিল। সেখানেও বউদি নিজেদের আয়ও অনটনের কথা তুললেন। রেণুকণা মাসে মাসে খোরাকি খরচ বাবদ দশ টাকা করে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে বউদি চটে লাল, 'এত বেশী টাকা হয়েছে তোমাদের? আমরা কি হোটেল খুলে বসেছি যে, ভাত বেচে টাকা নেব?'

তার পর থেকে মা কেবল কলকাতায় চিঠির পর চিঠি লিখছেন। শ্যামবাজার বউবাজার ভবানীপুর টালিগঞ্জ—কত ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছেন তার ঠিক নেই। কত মাসী পিসী ভগ্নীপতি ভাইপোকেই না রেণুকণা অনুরোধ করে দেখলেন। কিন্তু কেউ সেবার ভার নিতে চায় না। কারও বাড়িতে জায়গা কম। কারও বা অসুখবিসুখ। কেউ বা আইবুড়ো মেয়ে আর বেকার ছেলেদের নিয়ে নিজেই বিব্রত। আর প্রায় সবাই ব্যাপারটা জানে। বহুকাল ধরে সুখময়ের আর কোন খোঁজ তাঁরা না রাখলেও দু বছর আগে তাঁর মেয়েকে যে গুণ্ডারা নিয়ে গিয়েছিল আর তিন মাসের মধ্যে তার কোন সন্ধান মেলেনি খবরের কাগজের কল্যাণে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুরই সে কথা জানতে বাকি নেই। তা ছাড়া হিন্দুরক্ষা-সমিতি আর পাল চৌধুরীদের পরামর্শে সুখময় কেস করেছিলেন। তার ফলে ঘটনাটা আরও জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

অন্য দিনের মত আজও সেবা বলল, 'দরকার নেই মা কোন আত্মীয়-স্বজনকে আর লেখালেখি করে। আপন চেয়ে পর ভাল। কোন আশ্রম-টাশ্রমেই আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

রেণুকণা মাথা নেড়ে বললেন, 'না বাপু, কোন আশ্রমে তোমাকে আমি পাঠাব না। লোকের মুখে যা সব শুনি! আর কোথাও জায়গা না হয় তুমি আমার কাছেই থাকবে। এ জায়গা তো তোমার আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।'

সেবা চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, মা যাই বলুক, একবার সে এখান থেকে ছাড়া পেলে হয়। তা হলে কোন আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে সেবা আর যাবে না। যেমন করেই পারুক নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নেবে।

স্বজনকুটুম্বের গলগ্রহ হয়ে থাকার সুখ সে এই ক'মাসে ভাল করেই টের পেয়েছে।

পুবের ঘরে রেণুকণার শাশুড়ী তরুবালার ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ আগে। তবু চুপ করে শুয়ে পড়ে আছেন। উত্তরের ঘরে মা আর মেয়ের মধ্যে যে আলাপ চলছে মাঝে মাঝে কান খাড়া করে তা শোনবার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না। কান দুটো একেবারেই গেছে। তা ছাড়া ছেলে বউ নাতি নাতনী কেউ চায় না যে তিনি সংসারের কোন কথায় থাকুন, কোন কথা বুঝুন। তাঁকে একেবারে ওরা বাদ দিয়েই চলতে চায়। যেন তিনি এ সংসারের পর। যেন একটা বোঝা ছাড়া কিছুই না। তরুবালা মনে মনে বলেন 'আরে, কোত্থেকে তোরা সব এলি, কোত্থেকে জন্মালি তোরা – সে কথা কি কেউ একবারও ভেবে দেখিস? তোরা কি ভেবেছিস ওই হাত পা বল বুদ্ধি বয়সের জোর চিরকাল থাকবে! একদিন তোরাও আমার মত হবি। তাই যেন হোস। আশীর্বাদ করি আমার মত বয়স তোরা সবাই পাস। পেয়ে যেন সব বুঝতে পারিস। রাধাগোবিন্দ! রাধাগোবিন্দ! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য।' হাই তুলে তুড়ি দিলেন তরুবালা। তার পর মিসির কৌটো থেকে এক টিপ মিসি নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন। দাঁত যত দিন ছিল দিনের মধ্যে তিন-চারবার করে তাতে মিসি রাখতেন। এখন একটি দাঁতও আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাই বলে মিসি দেওয়ার অভ্যাস যায় নি। মুখের মধ্যে মিসিটুকু রেখে মাঝে মাঝে আনাচে কানাচে পিক ফেলেন। আর তাই নিয়ে পুত্রবধূ রেণুকণার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঝগড়া লেগে যায়।

রেণুকণা বলেন 'পিক ফেলে ফেলে বাড়িঘরের কিছু আর রাখলেন না। অত যদি নোংরা করেন, আপনি নিজের হাতে সব পরিষ্কার করবেন। আমি পারব না। সকলেরই ঘেন্নাপিত্তি বলে জিনিস আছে শরীরে। আপনার ছেলে কি দশটা ঝি-চাকর দাসী-বাঁদী রেখেছে যে, তারা এসে এ সব

তরুবালারও কথায় কথায় ধৈর্যচ্যুতি হয়। দন্তহীন মুখখানাকে আরও বিকৃত করে বলেন, 'কেন করবি নে শুনি? ছেলে আমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরি নি, না কি কোত্থেকে কুড়িয়ে এনেছি? খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করি নি? আর কিছু না দিক, সেই খেজমতের দামটা তো দেবে? ওলো, দশ মাস দশ দিনের গুদাম ভাড়াটা তো সে দেবে। না কি তাও তাকে তুই দিতে দিবি নে?' একটু থেমে ফের গজগজ করতে করতে বলেন, 'কথায় কথায় কেবল ঝি-চাকর দাসীবাঁদীর খোঁটা! আমার ছেলেই না হয় না পেরেছে। সেই না হয় গরিব। তোর বাপের ক গণ্ডা ঝি-চাকর দাসদাসী ছিল তা যেন জানতে বাকি আছে আমার। এতই যদি বড়লোক দু-এক গণ্ডা পাঠিয়ে দিলেই পারত। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আয়েশ করত মেয়ে।'

রেণুকণা চিৎকার করতে থাকেন, 'তুই-তোকাবি করবেন না বলে দিচ্ছি। কথায় কথায় তুই-তোকারি করবেন না। এখন আমারও বয়স হয়েছে, ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। তাদের সামনে আমাকে যদি অপমান করেন তারা আপনাকে ছেড়ে দেবে না।'

তরুবালা বলেন, 'হ্যাঁ, এখন তাই বাকি আছে। ছেলেমেয়ে লেলিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবি। মারের ভয়ে উচিত কথা বলব না এমন বাপের বেটী পাস নি আমাকে।'

কথায় কথায় তুমুল ঝগড়া লেগে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চেঁচামেচি গালাগাল চলতে থাকে। রেণুকণা থামলেও তরুবালা থামতে চান না। শেষ পর্যন্ত পাড়াপড়শীর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে নালিশ করেন, 'বছরে দুখানা থান আর দিনে এক মুঠো করে ভাত এই তো লাগে। তা দিতেও ওর বুক ফেটে যায়। আর শখের মধ্যে আছে মাসে আধ পো করে তামাক। তা যেন ওদের চক্ষের বিষ। আমি কি খাই! কত রকম-বেরকমের খাবার, কত সাধ-আহ্লাদের জিনিস আনিস, খাস, ফেলিস ছড়াস, আমার বাঁ পাও তার ধার দিয়ে যায় না। আমার ওই তামাকটুকুর ওপর কেন তোরা অমন নজর দিস? ভগবান, তুই দেখিস, তুই দেখিস।'

আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন তরুবালা। মাথার কাঁচা পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে মোটা থান দীর্ঘ শরীর সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। সত্তর পেরিয়ে গেছে বয়স। তবে এখনো বেশ চলে ফিরে করে-কর্মে খেতে পারেন।

উঠন পেরিয়ে উত্তরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তরুবালা। বউমা আর নাতনীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ রে, কি লিখছিস তোরা? আজ আবার কোথায় পত্তর লেখা হচ্ছে?'

রেণুকণা কি যেন মেয়েকে আস্তে বললেন। সেবা তা একটু চেঁচিয়ে তরুবালার কানে পৌঁছে দিল, 'তোমার তা দিয়ে দরকার কি ঠাকুরমা? মা কলকাতায় তার এক দাদার কাছে চিঠি লিখছে।'

তরুবালা বললেন, 'মিছিমিছি কাগজ কলম আর পয়সা নষ্ট। কত দাদাভাইয়ের কাছেই তো এ যাবৎ চিঠি লেখালেখি করলে। কেউ তো একখানা চিঠি দিয়ে শুধোয়ও না। এত পূজো যায় পার্বণ যায় একখানা কাপড়চোপড় দিয়ে কেউ তত্ত্বতল্লাস করে? আত্মীয় বল, বন্ধু বল, সব বড়লোকের। ভগবান ছাড়া গরিবের আর কেউ নেই।'

ভগবান যে গরিবেরই সব সময় সহায়—এ কথা সেবা আর বিশ্বাস করে না, রেণুকণাও না। তাই শাশুড়ীর কথার জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

মা মেয়ে দুজনকেই চুপ করে থাকতে দেখে তরুবালা হঠাৎ অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন। ঝাঁজালো স্বরে বলতে লাগলেন, 'ও-সব লেখালেখি করে কিছুই হবে না। তার চেয়ে আমি যা বলি তাই কর। কানা হোক, খোঁড়া হোক, দোজবরে তেজবরে যাকে পাও মেয়েকে পার করে দাও। ও-মেয়ের জন্যে আর বাছাবাছি করো না বউমা। ভগবান যদি দিন দেন পরেরটিকে দেখে-শুনে দিয়ো।'

রেণুকণা বললেন, 'আপনার কাছে তো সে পরামর্শ নিতে যাই নি মা। যা করবার আমরা ভেবে চিন্তে করব। আপনাকে আমার ভালমন্দের মধ্যে আসতে হবে না। নিজের জপতপ পূজো-আর্চা নিয়ে আছেন তাই থাকুন।'

তরুবালা বললেন, 'কি করে থাকি! দিনরাত একটা কাঁটা যে গলায় বিঁধে আছে।'

রেণুকণা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'না, সেবা আপনার গলার কাঁটা নয়। তা আপনি মোটেই মনে করবেন না। সেবার সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই। সেবা আমার মেয়ে। তার জন্যে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

তরুবালা মুখ বিকৃত করে বললেন, 'বদমাশ মাগী। যেমন মা তেমনি মেয়ে। নইলে কি ভদ্দরলোকের মেয়ের এমন মতিগতি এমন দুর্দশা হয়? তোর মেয়ে? তুই ওকে বিয়ের আগেই জুটিয়ে এনেছিলি? তাই বল্। দশজনের সামনে সে কথা সত্যি করে বল্। দেবতার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বল্—আমার বংশের কোন রক্ত ওর মধ্যে নেই। আমি রেহাই পাই, নিষ্কৃতি পাই।'

আশেপাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। পাড়াপড়শী বউঝিরা কেউ বা জ্বালানী কাঠের ঝাঁকা কেউ বা জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। শাশুড়ী-বউয়ের এ ঝগড়া মেটাবার জন্যে কারও কোন গরজ ছিল না। কারণ এ ঝগড়া প্রায়ই লাগে আবার আপনিই মিটে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে বই পড়ে পড়ে চোখটা ঝাপসা লাগছিল সেবার। তারপর মা আর ঠাকুরমার এই বিরামহীন কুৎসিত ঝগড়ায় তার অস্বস্তির আর সীমা ছিল না। সে ভাবল, চোখ মুখ মাথাটা ভাল করে ধুয়ে নেয়।

উঠনের পুব-দক্ষিণ কোণে পেয়ারাগাছটার বাঁ দিকে একটি ছোট ইঁদারা। তলায় অল্প একটু জল এখনও আছে। ইঁদারার ধারে লম্বা দড়ি বাঁধা একটি বালতি। সেবা সেই বালতিটা ইঁদারায় নামিয়ে দিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তরুবালা ছুটে এসে নাতনীর হাত চেপে ধরলেন, 'এই হতচ্ছাড়ি, জাতজন্ম-খোয়ানো বদমাশ মেয়ে! আমার ইঁদারার জল নষ্ট করলি কোন্ সাহসে? সরে যা, সরে যা।'

সেবা বালতিটা তুলে রেখে জলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুরমা!'

তরুবালা বললেন, 'চোখ রাঙাচ্ছিস তুই কাকে? ওতে আমি ভুলব না।

এ তোর বাপের করা ইঁদারা নয়। এ আমার নিজের টাকার ইঁদারা। তোর বাপ যখন রোজগার করতে শেখে নি তখনকার। ও-জল আমার দেবতার পূজোয় লাগে। খবরদার, ও-জল তুই নষ্ট করবি নে, আমার ইঁদারায় তুই হাত দিবি নে।'

পড়শীদের মধ্যে বামুনের ঘরের দু-একজন বিধবাও ছিলেন, তাঁরা সায় দিয়ে বললেন, 'সত্যি, ইঁদারাটা সেবার ছোঁয়া উচিত নয়। ওই জল যখন ওঁর দেবসেবায় লাগে, উপোস-টুপোস করে আমরাও এক এক সময় জল নিয়ে খাই। এমন ঠাণ্ডা ইঁদারা এ পাড়ায় আর নেই। জলটা আর একজন কেউ ওকে তুলে দিলেই তো পারে।'

কিন্তু তাঁদের সালিসির ভাষা রেণুকণার উচ্চ চিৎকারে ডুবে গেল। তিনি সম্মান সম্ভ্রম ভুলে গিয়ে শাশুড়ীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'আমার খাবি আমার পরবি, আর আমারই জাত মারবি এমন করে? ডুবে মর্, ডুবে মর্। তোর ওই সাধের ইঁদারায় তুই ডুবে মর্।'

তরুবালা বললেন, 'আমি তো আর অন্যায় করি নি, পাপ করি নি, আমার তো আর জাত নষ্ট, ধর্ম নষ্ট হয় নি। মরতে হয় তোরা মর্।'

সেবা বলল, 'তাই মরব ঠাকুরমা, তাই মরব। দোহাই তোমার, চুপ কর এখন।'

ঘরে এসে মায়ের লেখা সেই দীর্ঘ চিঠিখানার এক পাশে সেবা নিজের জবানীতে দু এক ছত্র এবার লিখে দিল—বড়মামা, আপনার পায়ে পড়ি। বেশীদিনের জন্যে না হোক, এক মাসের জন্যে, অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে আমাকে আশ্রয় দিন। আমার বড় বিপদ। এক সপ্তাহ পরে আমার নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব। ইতি হতভাগিনী সেবা।

এনভেলপ কেনাই ছিল। চিঠিটা ভাঁজ করে তার মধ্যে ভরে জিভ দিয়ে ভিজিয়ে খামটার মুখ বন্ধ করে সযত্নে ইংরেজীতে ঠিকানাটা লিখে দিল সেবা। চৌধুরীদের বার-বাড়িতে দেয়ালের সঙ্গে একটা ডাক-বাক্স ঝুলানো আছে। চিঠিটা তার মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্যে সেবা সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রতিবেশিনীরা একটু সরে গিয়ে তার পথ ছেড়ে দিল। কেউ ভয়ে, কেউ ঘৃণায়।

সেই বিধবা স্ত্রীলোক দুটি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'দেমাক দেখ।'

আর একজন বললেন, 'হবে না দেমাক? নেংটার নেই বাঁটপাড়ের ভয়। ওকে গুণ্ডারা একবার ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিল। ও কতজনের বাড়িতে ডাকাতি করবে। কত কচি কচি ছেলের মুণ্ডু খাবে তার ঠিক কি!'

২

রাত প্রায় আটটার সময় সুখময় সরকার দোকান থেকে ফিরে এলেন। অন্যদিন ফিরতে তাঁর আরও রাত হয়। সাড়ে দশটা এগারটার আগে কোনদিন ফিরতে পারেন না। স্টেশনারি দোকানের কাজ। হিসেবপত্র বুঝিয়ে ক্যাশ মিলিয়ে দেড় মাইল পথ হেঁটে আসতে কি কম সময় লাগে? কিন্তু আজ দোকানের মালিক জগদ্বন্ধু দাসের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন সুখময়। বলেছেন, তাঁর বাড়িতে আজ বড় দরকার। সেবার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে একজন আত্মীয় আসবেন। এ সময় সুখময়ের বাড়িতে না থাকলে চলে না। আসলে স্টেশনের বাজার থেকে একটি ইলিশমাছ কিনেছেন সুখময়। মাছটি ঠিক সময়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারলে আজ আর রান্না হবে না। যেটুকু দেরি হয়েছে তাতেই ঘরের পরিবার সাতবার মুখ-ঝামটা দেবে। অথচ ইলিসমাছ এ অঞ্চলে সুলভ নয়। চালানী মাছ যা আমদানি হয়, থানা-কাছারির লোকেরা তা প্রায় কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়, সাধারণ লোকের ভাগ্যে এই চড়াদামের দেবভোগ্য মাছ খুব কমই জোটে। জেলেকে অনেক বলে-কয়ে অর্ধেক দাম তার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে তবে এই মাছটি সুখময় সংগ্রহ করতে পেরেছেন। মাছের উপযুক্ত তরকারি হিসাবে বেগুন আর কচু দুই-ই কিনেছেন। সেবার মা যা ভাল বোঝে তাই করবে। রান্নার ব্যাপারে মেয়েদের হাতে সব ভার ছেড়ে দেওয়াই ভাল। নইলে ওদের মেজাজ নষ্ট হয়। ঝোল তরকারিতে নুন ঝাল ঠিকমত হয় না। আর খাওয়ার সুখটিও মাটি হয়ে যায়।

দোকানের মালিক জগদ্বন্ধু বয়সে সুখময়ের চেয়ে দশ বার বছরের ছোট। তাই কর্মচারী হলেও তাঁকে দাদা বলে ডাকে। পৈতৃক আমলের এই বিশ্বস্ত লোকটিকে জগদ্বন্ধু সম্মানও করে। সে জানে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে

সুখময়ের একটু দুর্বলতা আছে। মাছ-মাংসের ওপর বড় লোভ এই মানুষটির। কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে কোনদিন কোন প্রতারণা প্রবঞ্চনা করেন নি সুখময়। জগদ্বন্ধুর বাবা দীনবন্ধুও সুখময়ের চরিত্রবত্তার সুখ্যাতি করে গেছেন। মৃত্যুর আগে বলেছেন, 'সুখময় আমার দুঃখের দিনের সঙ্গী। মানুষটি সৎ ও যেন চাকরি ছেড়ে না যায়, ওকে ছাড়াস নে। লোকটির পয় আছে।'

তবু দু ঘণ্টা আগে সুখময়কে জগদ্বন্ধু সহজে ছেড়ে দিতে চায় নি। অনেক অনুরোধ উপরোধ করবার পর ছেড়েছে। হেসে বলেছে, 'সুখময়দা, আপনার বাড়িতে অতিথ কুটুম্ব ঘটক-ফটক কেউ যায় নি। যাচ্ছে ইলিশমাছ। একাই খাবেন, না, আমরাও আসব সঙ্গে?'

সুখময় টেনে টেনে হেসেছে, 'বেশ তো, এস না, এস না। সে তো আমার পরম ভাগ্য। হে হে হে!'

জগদ্বন্ধু বলেছে, 'যাচ্ছেন যান। কাল কিন্তু সকাল সকাল আসবেন। একটুও দেরি করবেন না যেন।'

সুখময় বলেছেন, 'আরে, না না। আমার সে দায়িত্ব নেই? নেহাত এত দামের ইলিশমাছটা নষ্ট হয়ে যায় তাই। নইলে এখন কি আমার বাড়ি ফেরার সময়? শালা রাজকুমার জেলে দেড়টি টাকা আমার কাছ থেকে অদায় করে নিলে। দু গণ্ডা পয়সা ছাড়লে না। আচ্ছা, আমিও দেখব, আমার কাছে কোনদিন ওকে আসতে হয় কিনা।'

মুড়ো আর লেজার সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা ইলিশমাছটি ডান হাতে আর বাঁ হাতে তরকারির থলিটি নিয়ে সুখময় দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে গরুর গাড়ি চণ্ডীপুরের দিকে যায়। যাদের সঙ্গে মালপত্র কি বউ-ঝি থাকে তারাই ওঠে গাড়িতে। যাদের তা নেই তারা আর ওঠে না। সুখময় এ পথের নিত্য যাত্রী। এখনও যথেষ্ট তাঁর পায়ের জোর। তিনি গাড়ি-ঘোড়ার কথা মোটেই ভাবেন না। রাস্তাটা বড় আর পাকা করে এ পথে নাকি বাস চালাবার কথাবার্তা চলছে। তা হলে লোকের

পকেটে আর পয়সা থাকবে না। মানুষের স্বভাব তো। সে ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।

মাছের দামটা সগর্বে পথের সঙ্গীদের বলতে বলতে কুণ্ডুপাড়ার ভিতব দিয়ে সুখময় নিজের বাড়িতে এসে উঠলেন। সব নিঝুম চুপচাপ। মিট মিট করে একখানা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। ব্যাপার কি! আবার ডাকাত এসে সব লুটে নিয়ে গেল নাকি?

'সেবা! সেবা!' বড মেয়েব নাম ধরেই প্রথমে ডেকে উঠলেন সুখময়।

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, 'যাই বাবা।'

একটু বাদেই হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে সেবা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সুখময় বললেন, 'বাঁচালি মা। আমার গা-ছমছম করছিল। যা অন্ধকার রাত।'

সেবা বলল, 'তোমাকে এত কবে বলি বাবা, একটা হ্যারিকেন নাও। কি একটা টর্চ ঠর্চ কিছু কিনে নাও। তা তো শুনবে না। এই অন্ধকারে চলতে চলতে একটা দারুণ হোঁচট-টোচট খাবে একদিন। তা ছাড়া সাপখোপেব ভয়ও কি তোমাব নেই?'

সুখময় বললেন, 'ঠিক যেন আমার বুড়ো মা-ঠাকরুণ। না রে না, অন্ধকাব তো ভাল, চোখ বেঁধে দিলেও আমি এই পথটুকু পার হয়ে আসতে পারি। হ্যাঁ রে, তোর মা আর ঠাকুরমা কোথায়?'

সেবা বলল, 'তারা যে যার ঘরে শুয়ে আছে।'

সুখময় বললেন, 'আর সতী সুদেব? তাবাও কি এই ভরসন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? তাদেব পড়াশুনা নেই?'

সেবা কোন জবাব দিল না।

সুখময় বললেন, 'শিগগির ডেকে তোল্, ডেকে তোল্। বল্ ইলিশমাছ এনেছি। নে, মাছটা ধর হাত থেকে।'

সেবা বিরস মুখে বলল, 'এত রাত্রে আবার মাছ নিয়ে এলে কেন বাবা?'

সুখময় সেবার কথাটার একটু বিকৃত প্রতিধ্বনি করে বললেন, 'মাছ নিয়ে এলে কেন বাবা! ঠিক একেবারে মায়ের ধারা পেয়েছিস।' তারপর একটু

হেসে বললেন, 'মাছের গড়নটা দেখেছিস! পেটের দিকটা কি রকম চ্যাপটা দেখেছিস! দারুণ তেল হবে মাছটায় জানিস সেবা। আর মাছের তেল গরম ভাতে খেতে যা লাগে। আহা-হা! ঘি-মাখনকে বলে পিছে থাক্। একটা বাটিতে করে তেল গলিয়ে রাখিস। যা, মাছটা কুটে এখনই চড়িয়ে দে। আচ্ছা সেবা, ঝোল করবি না সরষে-পাতরি।'

সেবা বলল, 'যা হোক একটা করব। তুমি যাও হাত মুখ ধুয়ে ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও।'

মাছহাতে রান্নাঘরের দিকে চলল সেবা।

সুখময় ঘরে গিয়ে দেখলেন, পুবের তক্তপোশখানায় রেণুকণা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। নীচে মাদুর পেতে সতী আর সুদেব পড়তে বসেছিল। বই খাতা সামনে রেখে তারাও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। সতীর বয়স বারো, সুদেবের দশ। একজন পড়ে ক্লাস সিক্সে আর একজন ফোরে। কারুরই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া উচিত নয়। পড়াশুনো না করলে পাস করবে কি করে?

সুখময় হাঁক দিলেন, 'এই ওঠ্, ওঠ্ শিগগির। খুব পড়া হচ্ছে।' তার পর স্ত্রীর দিকে এগিয়ে তাঁর গায়ে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললেন, 'কি গো, রাত আটটা বাজতে না বাজতে ঘুমে যে বিভোর হয়ে রয়েছ! ছেলে মেয়ে দুটোরও তো কিচ্ছু হচ্ছে না।'

রেণুকণা ঘুমোন নি। কিন্তু তাঁর পাশ ফিরবার কোন লক্ষণও দেখা গেল না। তিনি মুখ ফিরিয়ে থেকেই বললেন, 'না হলে আমি কি করব! টাকা দিয়ে বাড়িতে মাস্টার রেখে দাও। বড়লোক মানুষ তুমি। তোমার সঙ্গে কার তুলনা!'

সুখময় হাসলেন, 'বড়লোক! বড়লোক তো বটেই। চালচলনে না হোক, খাওয়াদাওয়ার বহরটা দেখে সবাই কিন্তু বড়লোক বলেই ভাবে আমাদের। জান বাজারের সেরা ইলিশ আজ কিনে নিয়ে এসেছি। বুকের বড় পাটা না থাকলে এ বাজারে কেউ ইলিশ কিনতে পারে না। ট্যাঁকের জোরের চেয়ে বুকের জোরটাই লোকের বেশী দরকার। সেই জোরেই কাজ হয়।'

রেণুকণা এবার মুখ ফিরিয়ে রুক্ষস্বরে বললেন, 'থাক্ থাক্, আর জোরের বড়াই কোরো না। যার মেয়েকে গুণ্ডায় কেড়ে নেয়, গাঁয়ের মধ্যে যে এক-ঘরে হয়ে থাকে, সময়মত বয়স্থা মেয়ের যে বিয়ে দিতে পারে না, তার আবার জোর আর সাহসের বড়াই। তোমার জোর কেবল মুখে। তোমার দুনিয়া কেবল নিজের মুখ আর পেটটুকুর মধ্যে। এ ছাড়া সংসারে তোমার আর কিই বা আছে! আর কার ভালমন্দের দিকেই বা তুমি তাকিয়ে দেখ।'

সেবা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। তিরস্কারের সুরে বলল, 'মা, এই রাত দুপুরে আবার বুঝি শুরু হল তোমাদের? সারাদিন তো ঝগড়া করে কেটেছে। তাতেও তৃপ্তি হল না?'

সুখময় এতক্ষণে ঘামে-ভেজা গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে রাখতে রাখতে বললেন, 'ও তাই বল! ঝগড়া হয়েছে। বাড়ির ভাবভঙ্গি দেখে আমার তাই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। হ্যাঁ রে সেবা, আজ বুঝি আবার শাশুড়ী-বউতে লেগেছিল?'

সেবা কিছু বলবার আগে রেণুকণাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, লেগেছিল। আমার খাবে আমার পরবে আবার আমারই জাত মারবে! মুখ হাসাবে লোকের কাছে! হয় আমাকে সরিয়ে দাও, না হয় তোমার মার একটা ব্যবস্থা কর। আমি আর পারব না।'

স্ত্রীর ক্রোধ উপশমের চেষ্টা করতে করতে সুখময় বলেন, 'আরে, কি হয়েছে ব্যাপারটা তাই বল না। নতুন করে আবার কি হল তোমাদের! ও সেবা, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা মা, মাছটা দেখ গিয়ে।'

তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে একটু তোষামোদের সুরে মিষ্টি করে হেসে সুখময় বললেন, 'যাও না, কত দামী মাছ। ছেলেমানুষের হাতে পড়ে নষ্ট হবে, তুমি একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দাও না গিয়ে। শত হলেও তোমার রান্নার কাছে কি কারও রান্না লাগে!'

বাপ-মায়ের দাম্পত্যালাপ শুরু হওয়ার আগেই সেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এই মধুর আলাপে রেণুকণা যোগ দিলেন না। তিনি ঠোঁট উল্টিয়ে

বললেন, 'থাক্ থাক্, আর বুড়ো বয়সে ঢঙ করতে হবে না। আমার বাঁ পা কেঁদেছে এত রাত্রে ওই মাছ রান্না করবার জন্যে। ফেলে দাও—ছুঁড়ে ফেলে দাও ওই মাছ। হাড় জ্বালাতে কোনও দিক থেকে তুমি বাকি রাখবে না আমার।'

সুখময় জামা কাপড় ছেড়ে খাটো একখানা ধুতি পরলেন। দশ বছরের ছেলের পুরনো ছেঁড়া একখানা ধুতি। সুদেব হাফপ্যান্টই পরে। শখ করে পূজোর সময় ধুতিখানা কিনে দিয়েছিলেন সুখময়। সেই কাপড়খানা এখন তাঁরই লুঙ্গির কাজ করে।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে নামতেই অন্ধকারে একটি কালো ছায়া যেন তাঁর দিকে এগিয়ে এল। প্রথমে একটু চমকে উঠলেন সুখময়। কিন্তু পর মুহূর্তেই চিনতে পারলেন, ছায়াটা আব কিছু নয়, তাঁরই মা।

সুখময় বললেন, 'মা, তুমি এখানে ?'

তাঁর বুঝতে বাকি বইল না, রেণুকণা যা বলেছেন তার সবই আড়ি পেতে শুনেছেন তরুবালা। ভাল কথাটুকু শুনতে পান না, কিন্তু নিন্দামন্দ তাঁর সবই কানে যায়। আব আড়ি পেতে অন্যেব কথা শোনা ছেলেবেলার সেই অভ্যেস আজও ছাড়তে পারেন নি।

সুখময় অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আবার এতরাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসেছ কেন মা ?'

তরুবালা বললেন, 'আমাকে চিতার বিছানায় শুইয়ে রেখে এস বাবা, আর উঠব না।'

সুখময় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার কি হল তোমাদের ? বউকে বাড়িতে আনা অবধি তো ঝগড়া শুরু করেছ। এ ঝগড়া তো তোমাদের নতুন নয়।'

তরুবালা বললেন, 'এতদিনে সার বুঝা বুঝেছ বাবা। আমিই তোমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছি। আমি মন্দ, আমি খারাপ, আমাবই সব দোষ। সংসারে আর কারও কোনও দোষ নেই। তাই যখন তোমার বিশ্বাস, তখন আমাকে বাদ দিয়ে দাও। পরিবারের হুকুম তো পেয়েই গেছ। কাশি-বৃন্দাবনের আশা আমি করিনে। তেমন ভাগ্য আমি

করে আসি নি। ধারে-কাছে কোন দেবস্থানে আমাকে তুমি দিয়ে এস। সেখানে আমি দশজনের কাঁছে ভিক্ষে করে খাব, সেও ভাল। তবু যেন এখানকার ভাত আমার না খেতে হয়। ভাত তো নয়—বিষ, বিষ, বিষ।'

সুখময় এসব কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি জানেন কথা বাড়ালেই বাড়ে। ইঁদারার কাছে বড় একটা বালতিতে জল তোলা আছে। সেই ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুতে লাগলেন সুখময়।

ছেলে কোন জবাব না দেওয়ায় তরুবালার মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'কী কথার ছিরি! আমার খায়, আমার পরে! বলি ও চোখখাকী, টাকা তোর কোন্ বাপ এসে দিয়ে যাচ্ছে! তোর কোন্ বাপ এসে আমাব ঘরে ধানের গোলা বসিয়ে দিয়ে গেছে! ও-কথা বলতে লজ্জা হল না? একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার কেউ নেই, একগাছি সুতো দিয়ে শুধোবার কেউ নেই,—সেই বাপের বাড়ির আবার অত বড়াই। আর কেউ হলে লজ্জায় ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরত। তুই বলে মুখ তুলে কথা বলতে আসিস।'

রেণুকণা ইলিশমাছের খান কয়েক ভেজে তুলে রেখে বাকি মাছ কখানা দিয়ে ঝোল রাঁধবার আয়োজন করতে করতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলি? শুনলি কথাগুলো?'

সেবা বলল, 'যা খুশী বলুক মা, তুমি কান দিও না, তুমি জবাব দিও না। একা একা কতক্ষণ আর চেঁচাবে!'

সুখময়ের পুরনো ছেঁড়া চটিজুতোর শব্দ রান্নাঘরের দোর পর্যন্ত এগিয়ে এল। তিনি ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে বললেন, 'মাছটায় সত্যিই খুব তেল আছে, না সেবা?'

মেয়েকে কিছু বলতে না দিয়ে রেণুকণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তেল না ঘোড়ার ডিম আছে। ভাল চাও তো কালই একটা ব্যবস্থা করো। এত অশান্তি নিয়ে আমি আর থাকতে পারব না। আর ওই ইঁদারাটা। কালই যদি ওই ইঁদারাটা তুমি বন্ধ করে না ফেল আমি ওর মধ্যে ডুবে মরব।'

সুখময় বললেন, 'ব্যাপার কি? ইঁদারা নিয়ে আবার কি হল তোমাদের।'

রেণুকণা বিকালের ঝগড়ার আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন। শাশুড়ীর বিরুদ্ধে বাড়িয়েও বললেন খানিকটা। সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন সুখময়। নিজের মায়ের ওপর মনটা তাঁর অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সত্যি এ কি জাতনাশা কাণ্ড! নিজের ছেলে বউ নাতনীকে পাড়ার আর পাঁচজনের সামনে অপদস্থ করে কি সুখ পান তরুবালা! তাঁর শুচিবাই, খাওয়া ছোঁওয়া নিয়ে বাছ-বিচার আছে জেনে সেই দুর্ঘটনার পর থেকে সুখময় নিজেই মেয়েকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন—'মার ঠাকুরঘরে তোর গিয়ে কাজ নেই সেবা। ওঁর রান্নাঘরেও তুই যাস নে।' সেবা বলেছিল, 'কেন?' সুখময় আমতা আমতা করে বলেছিলেন, 'মানে বুড়ো মানুষ, উনি যখন সব মানেন—'

রেণুকণা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'মানলেই এসব সহ্য করতে হবে? বল কি তুমি? আমার ওই কচি মেয়েটার কি দোষ? ও কি ইচ্ছে করে ওর জাত দিয়েছে যে তাকে তোমরা ছোঁবে না, তার হাতের জল খাবে না? নিজেরাই যদি এমন করে ওকে অস্পৃশ্যা করে রাখ, তা হলে আর পাড়াপড়শীর দোষ কি!'

সুখময় বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, 'আরে আমি কি তোমার আমার কথা বলছি? মা বুড়ো মানুষ, ছেলেবেলা থেকে আচারবিচার মানেন। তারপর তীর্থ-টীর্থ করে আসবার পর তাঁর নিয়মনিষ্ঠা বেড়েছে। তাই বলছিলাম—'

রেণুকণা রাগ করে বলেছিলেন, 'তিনি থাকুন তাঁর নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েটাকে তোমরা শেয়াল-কুকুরের মত দূর দূর করবে তা আমি নিজের চোখে দেখতে পারব না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে গিয়ে থাকি সেই ভাল।'

সুখময় পড়েছিলেন মহাসঙ্কটে। মার আচার-বিচার, সংস্কারের মানই রাখবেন, না স্ত্রী-কন্যার ওপর মমত্ব দেখাবেন? কিন্তু বাবা আর ঠাকুরমার মনোভাব টের পেয়ে সেবা নিজেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল।

আলাদা রান্নাঘর আছে তরুবালার। সেখানে তিনি নিজের হাতে

আতপ চালের ভাত আর নিরামিষ তরকারি রান্না করেন। শরীর নিতান্ত খারাপ হয়ে পড়লে রেণুকণা তাঁর জন্যে রেঁধে দিতেন। সেবাও মাঝে মাঝে রাঁধত। আরও ছেলেবেলায় খাওয়ার সময় তাঁর সামনে এসে চুপ করে বসে থাকত সেবা। নিজেদের ঘরে মাছ তরকারি খেয়েও তার সাধ মিটত না। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঠাকুরমার পাতের প্রসাদ তার রোজ পাওয়া চাই। পাছে ঠাকুরমা খুঁতখুঁত করেন, পাছে বলেন—তোর কাপড়ে এঁটো লেগে রয়েছে, তাই নিজের ফ্রক কি শাড়ি ছেড়ে মায়ের ধোয়া শুকনো শাড়িখানা গায়ে জড়িয়ে সেবা এসে ঠাকুরমার কাছে হাত পাতত, দাও ঠাকুরমা, দলা দাও। মানে শুকনো শুকনো ডাল তরকারি দিয়ে আর কাঁচা-লঙ্কা ঘষে আঁটা-আঁটা করে মাখা ছোট ছোট দুটি ভাতের ডেলা সেবার চাই-ই চাই। তরুবালা খুশী হয়ে বলতেন, 'এতে যে বড় ঝাল! তুই খেতে পারবি?'

সেবা বলত, 'পারব ঠাকুরমা। তুমি দাও না।'

সেই অতিরিক্ত ঝাল-মাখা ভাত খেতে খেতে সেবার চোখ দিয়ে জল বেরোত। তবু সে মুখের ভাত ফেলে দিত না, বরং হাসতে হাসতে বলত, 'দেখ ঠাকুরমা, আমি ঠিক তোমার মতই ঝাল খেতে পারি।'

তরুবালা হেসে বলতেন, 'পারবি না কেন!' তুই বোধ হয় আর-জন্মে আমার মতই অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলি।' অবুঝ সেবা বলত, 'আমি এ জন্মেও তাই হব ঠাকুরমা। তা হলে তোমার মত অমন বড় একখানা কালো কুচকুচে পাথরে করে ভাত খেতে পারব। ঠিক অমনি লঙ্কা দিয়ে তেঁতুল দিয়ে—কি মজাই না হবে ঠাকুরমা!'

তরুবালা তাড়াতড়ি বাধা দিয়ে বলতেন, 'দূর আবাগী। ছি ছি ছি, ও-কথা বলতে নেই। অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই দিদি। বিধবা হওয়া কি ভাল রে? মোটেই ভাল নয়। বিধবাকে সবাই অলক্ষুণে অপয়া বলে ভাবে। কোন শুভকাজে তাকে কেউ ডাকে না, কোন আনন্দ-আহ্লাদে সে থাকে না। একজনের সঙ্গে সঙ্গে তার খাওয়া পরা সুখ শান্তি সব যায়, শুনেছি আগে আগে বিধবাকে নাকি জোর করে তার সোয়ামীর

চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারত। একবার পুড়লেই সব জ্বালার শান্তি হত। জীবনভোর জ্বলে পুড়ে মরতে হত না।'

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থেকে আবার ভাতের গ্রাস মুখে তুলতেন তরুবালা।

বারো তেরো বছর বয়স পর্যন্ত ঠাকুরমার সঙ্গে না খেলে সেবার পেট ভরত না, তাঁর পাশে তাঁকে জড়িয়ে ধরে না শুতে পারলে তার ঘুম হত না। তরুবালা সস্নেহে হেসে বলতেন, 'হতভাগী। শোবার ভঙ্গি দেখ ওর, যেন বরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে।'

সেই আদরের নাতনী তরুবালার এখন দু চোখের বিষ হয়েছে। সেবার হাতের জল খেলে তাঁর জাত যায়, সেবা তাঁকে ছুঁয়ে দিলে তিনি কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজলের ছিটে দেন, নাওয়ার সময় থাকলে নেয়ে আসেন। কিন্তু ইঁদারার জল তোলা সম্বন্ধে গোড়ার দিকে সেবার ওপর বাধা-নিষেধ থাকলেও শিথিল হতে হতে আস্তে আস্তে তা উঠে গিয়েছিল। তরুবালা যে মেটে কলসীতে জল রাখেন সেই কলসী সেবা ছোঁয় না। নিজের হাতে ঠাকুরমার জলের ঘটি এগিয়েও দেয় না। কিন্তু ইঁদারার জল তো থাকে অনেক নীচে। দড়ি-বাঁধা বালতিতে করে টেনে তুলতে হয়। ছোঁয়াছুঁয়িটা অত কাছাকাছি থেকে হয় না। তাই ওতে কোন দোষ নেই। পরম ঔদার্যের সঙ্গে তরুবালা নিজেই এ কথা অনেকবার বলেছেন। কিন্তু ঝগড়া লাগলে তাঁর সব মতামত বদলে যায়। তাকে যে অধিকার তিনি দিয়েছেন মুহূর্তের মধ্যে তা কেড়ে নিতে তাঁর সঙ্কোচ হয় না। আর কেবলই উল্টোপাল্টা কথা বলতে থাকেন। ছেলে বউ নাতি নাতনী কারও বিরুদ্ধেই অভিযোগ করতে তিনি বাকি রাখেন না। কিন্তু লোকে তো বোঝে না তাঁর বাহাত্তর বছর বয়স হয়েছে। তাঁর যে কথার ঠিক নেই, মাথার ঠিক নেই, মতিগতিও এক এক সময় এক এক রকম, বাইরের লোককে তা তেমনভাবে বোঝানো যায় না। তাই লোকে ভাবে, ছেলে আর ছেলের বউয়ের হাতে পড়ে বুড়ীর না জানি কত কষ্টই হচ্ছে! তাঁর খাওয়ায় কষ্ট, পরায় কষ্ট, শোওয়ায় কষ্ট। কষ্টের আর অবধি নেই। ঝগড়া লাগলেই পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে কাঁদতে বসেন

তরুবালা। মহা মুশকিল হয়েছে সুখময়ের। ঘরের লোকের জন্মে বাইরের লোকের কাছে মান-মর্যাদা তাঁর আর রইল না।

ইলিশমাছ রান্না হতে দেরি লাগলনা। সতী আর সুদেবকে নিজেই টেনে টেনে ডেকে তুললেন সুখময়। চোখের জলের ঝাপটা দিলেন, যাতে ঘুমের ঘোর কাটে। সতী আলাদা খেতে বসল। কিন্তু সুদেবকে নিজেই সঙ্গে নিয়ে বসলেন সুখময়। মাছ বেছে কাঁটা ছাড়িয়ে দিলেন। তবু ছেলের ঘুম ভাঙে না, ঝিমোয় আর খায়। জেলে বেটা ঠকিয়েছে। তেল নেই তেমন মাছে। রান্নাটাও তেমন জুতসই লাগছে না। কিন্তু সে কথা এই মুহূর্তে স্ত্রীকে বলতে ভরসা পেলেন না সুখময়। মুখ বুজে খেয়ে চললেন। মনটা আফসোস করতে লাগল, আহা-হা, এত দামের মাছ! মাছ খাওয়া তো নয়, যেন কাঁচা পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

রেণুকণা একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন খাচ্ছ? বলছ না যে কিছু? ভাল হয় নি বুঝি রান্না?'

সুখময় হেসে বললেন, 'না না, বেশ হয়েছে!'

জলভরা ঘটি নিয়ে আঁচাতে বেরোলেন সুখময়। তরুবালা তখনও রাত্রের জলযোগ শেষ করেন নি, ঘুমোতেও যান নি। বারান্দায় বসে আছেন তো আছেনই। ছেলেকে দেখে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি রে, কেমন খেলি মাছ?'

বাৎসল্যে স্নিগ্ধ আর কোমল তরুবালাব গলা। কে বলবে একটু আগে ঝগড়া আর চেঁচামেচিতে বাড়ি মাথায় করে তুলেছিলেন?

সুখময় তাঁকেও জবাব দিলেন, 'ভাল।'

তরুবালা বললেন, 'মাছটা তুই ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালবাসিস। কিন্তু পোড়া মাছ যেন দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে।'

একটু বাদে সেবা এসে দাঁড়াল, 'পান নাও বাবা।'

সুখময় স্মিত পরিতৃপ্ত মুখে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'নিই মা। যা, তোরা তাড়াতাড়ি এবার খেতে বোস্ গিয়ে। কত রাত হয়েছে। তোর খুব খিদেও পেয়েছে না রে সেবা? শুকিয়ে গেছে মুখখানা।'

সেবা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কই বাবা। তুমি ওই রকমই দেখ। আমি কি ছেলেমানুষ আছি নাকি যে আমার এত তাড়াতাড়ি খিদে পাবে?'

তা ঠিক। সেবা এখন আর ছেলেমানুষ নেই। পূর্ণযৌবনা সুখময়ের মেয়ে। সবাই বলে—এমন সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ের মধ্যে নেই। ভুল করে ও গরিবের ঘরে জন্ম নিয়েছে। ফুটন্ত পদ্মের মত ওর রূপ। কিন্তু হলে হবে কি। পোকা এসে এই পদ্মকে কেটে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। দুর্নাম রটতে কোথাও আর বাকি নেই। তাই যে মেয়ে রাজার ঘরে যাবার যোগ্য, তার সব সম্বন্ধ আসছে কানার সঙ্গে, খোঁড়ার সঙ্গে, দোজবরে, তেজবরে চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ের বাবা বুড়োহাবডাদের সঙ্গে। মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখবেন সেও ভাল। তবু প্রাণ থাকতে তাদের কারও হাতে মেয়েকে ধরে দিতে পারবেন না।

দিতে তিনি চান না। কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে বুড়ো জীবন পাল চৌধুরী। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ঘরে স্ত্রী নেই। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের ছেলেপুলে আছে। সেই জীবন টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে সুখময়ের পিছনে পিছনে, 'তোমার মেয়েকে দাও। তাকে আমি রাণীর হালে রাখব। রীতিমত মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমার কথাটা ভেবে দেখ সুখময়। আবার কোন্ দিন কোন্ বিপদ আপদ ঘটবে তার ঠিক কি! আমাকে দিলে সে ভয় নেই।'

পাজী বদমাশ বুড়ো ধাড়ী। ওই জন্যেই মেয়েকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। অন্তত কিছু দিনের জন্যেও আড়াল করতে হবে চোখের। লোকটির চোখ ভাল না। শনির চোখ, শয়তানের চোখ।

হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে মেয়ের সমস্যা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন সুখময়। রান্নাঘর থেকে মৃদু আলাপের শব্দ কানে আসে। মা আর মেয়ে এতক্ষণে খেতে বসেছে। খেতে খেতে গল্প করছে দুই সখীর মত।

৩

সকালের ডাকে চিঠি পেলেন শৈলেন্দ্রনাথ। বীমা কোম্পানির নোটিশ, ইলেকট্রিক বিল, দু-তিনখানা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে মেয়েলী হাতে ঠিকানা লেখা পুরু একখানা খামও এসেছে। খামের মুখটা ছিড়ে চিঠিখানার ভাজ খুলতে যাচ্ছেন, স্ত্রী নীরজা এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'কার চিঠি ?'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান বেশী নয়। শৈলেন্দ্রনাথ দু-তিন বছর আগে পঞ্চাশ পার হয়েছেন। আর নীরজার পঞ্চাশে পৌছতে এখনো দু-তিন বছর দেরি আছে। কিন্তু দুজনের মধ্যে আকৃতিগত তফাতটা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। শৈলেনবাবু ছিপছিপে রোগা। দীর্ঘ ছ ফুটের কাছাকাছি। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি। আর নীরজা বাঙালী মেয়েদের তুলনায় বেঁটে না হলেও শৈলেনবাবুর পাশে দাঁড়ালে বেশ বেঁটে বলে মনে হয়। শ্যামলা রঙ। হাড়ে মাসে জড়ানো পুষ্টাঙ্গ শরীর। স্থূলাঙ্গী কেউ তাঁকে বলবে না। বড় জোর বলবে স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু স্বামীর রোগাটে শরীরের পাশে তাঁর এই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুন্দরী বলা যায় না নীরজাকে। নাকের গড়ন চ্যাপটা, চোখ আশানুরূপ প্রশস্ত নয়। ঠোঁট দুটিও বেশ পুরু। কিন্তু চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যে তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না। আর তাকালে দুই চোখের ঔজ্জ্বল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে চাতুর্য আর বুদ্ধিমত্তা তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তা যেন এমন বয়সের এমন চেহারার একটি মহিলার কাছে দর্শক আশা করে না।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর আকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য আর বৈপরীত্য শুধু বাইরের লোকের চোখে ধরা পড়ে। শৈলেন বাবু কি নীরজা কেউ এ সম্বন্ধে আর

সচেতন আছেন বলে মনে হয় না। দেখে দেখে তাঁদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

জবাব না পেয়ে নীরজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার চিঠি? নামটা বলেও তো পড়তে পারবে। চিঠি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

শৈলেনবাবু এবার চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তোমারই বা অত তাড়া কিসের, কেই বা পালাচ্ছে? তুমিও না, আমিও না।'

নীরজা জবাব দিলেন, 'পালাতে পারলে তুমিও বাঁচতে, আমিও বাঁচতুম। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই!'

শৈলেনবাবু এবার স্ত্রীর প্রথম প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'চিঠি দিয়েছে মালদয়ের রেণু। তার মেয়েকে পাঠাবার কথা লিখেছে।'

নীরজা বিরক্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'তা আমি বুঝেছি। তার চিঠিতে ও ছাড়া আর কোন গৎ আছে নাকি?'

শৈলেনবাবু আর কোন কথা না বলে পিছনের সোফাটায় বসে পড়লেন। রেণুকণার চিঠিটা ততক্ষণে তাঁর পড়া শেষ হয়ে গেছে। সেটা রেখে দিয়ে কাগজপত্রগুলোর মোড়ক খুলতে শুরু করেছেন। নীরজা এগিয়ে এসে বললেন, 'চিঠিখানা দেখতে পারি একটু?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছা করলেই দেখতে পার। এর আগে তোমাকেও তো লিখেছিল চিঠি। তুমি জবাব দাও নি।'

নীরজা বললেন, 'সময় পাই নি তাই দিই নি। তুমি দিলেই পারতে।'

ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট এবং রুষ্ট হয়েছেন নীরজা। তিনি জবাব না দেওয়া সত্ত্বেও রেণুকণা ফের চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন আবার তাঁর স্বামীর কাছে। বোধ হয় বউদির নামে নালিশ জানানো হয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে খানিকটা ব্যবধান রেখে সেই সোফাতেই বসে পড়লেন নীরজা। বসে বসে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন।

ছোট ড্রয়িংরুমখানা সোফা কাউচে কার্পেটে রঙিন পর্দায় নিজের পছন্দমত করে সাজিয়েছেন নীরজা। হঠাৎ দেখলে বড়লোকের ড্রয়িংরুম বলেই মনে হয়। ধনী না হলেও নীরজা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি উঁচু ধাপ

অধিকার করে রয়েছেন, তাঁর শাড়ি-গয়নায় গৃহ-সজ্জায় রুচিতে মেজাজে তা পরিস্ফুট।

পরাশর রোডের চারখানা রুমের এই ফ্ল্যাটটিতে তাঁরা বছর তিনেক ধরে আছেন। এর মধ্যে নীরজা এ-ঘরের আসবাব ও-ঘরে নিয়ে কি শোবার ঘরের খাট-টেবিলের অবস্থান পালটে দিয়ে ফ্ল্যাটটার রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। জানালা-দরজার পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিলঢাকনি প্রতি তিন মাস অন্তর বদলানো হচ্ছে। পারলে মাসে মাসে বদলাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

নীরজা চিঠি পড়ে শেষ করবার আগেই তাঁর মেয়ে বীথিকা দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে এসে সামনে দাঁড়াল, 'মা, আমার কোন চিঠি এসেছে?'

নীরজা মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

বীথিকা আর কিছু বলবার আগেই হঠাৎ শৈলেনবাবু তার দিকে চেয়ে বললেন, 'বীথি, তোমাকে বলি নি দাঁত ব্রাশ করতে করতে তুমি আমার সামনে এসো না। আমি ওসব মোটেই পছন্দ করি নে।'

তাঁর এই ধমকে বীথিকা একটুও অপ্রস্তুত হল না। বরং সে বলল, 'বাবা তুমি যে এ ঘরে বসে আছ তা তো জানি নে। তা হলে আসতাম না। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

কিন্তু যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না বীথিকার। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অত মনোযোগ দিয়ে কার চিঠি পড়ছ মা?'

নীরজা জবাব দিলেন, 'তোর রেণুপিসীর।' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'মেয়ে কি এখন আগের মত খুকী আছে যে ওকে ধমকাচ্ছ। তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়েকে যখন-তখন অমন করে ধমকাতে তোমার লজ্জা করে না!'

শৈলেনবাবু একবার মেয়ে আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর মুখে অদ্ভুত একটু হাসি টেনে বললেন, 'তা ঠিক। যত লজ্জা তো আমারই।'

তারপর কাগজপত্রগুলো তুলে নিয়ে বাঁ পাশের ছোট ঘরখানার দিকে পা বাড়ালেন।

নীরজা বলে উঠলেন, 'ও কি, তোমার রেণুর চিঠিও নিয়ে যাও। এখান ফেলে যাচ্ছ কেন?'

এর উত্তরে তিনি স্ত্রী-কন্যার দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে নিজের ছোট পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বীথিকা পেস্টের ফেনা বাইরে খানিকটা ফেলে এসে হো-হো করে হেসে উঠল।

নীরজা বললেন, 'তুই হাসছিস! ভঙ্গি দেখলে আমার কিন্তু রাগে গা জ্বলে যায়।'

বীথিকা বলল, 'হাসব না কি করব? বাবাকে আমাদের ডাক্তার দেখানো উচিত। ক্রনিক ডিসপেপশিয়া ভাল করে না সারলে ভদ্রলোকের বদমেজাজ কিছুতেই যাবে না মা।'

নীরজাও এবার মুখ টিপে হাসলেন, বললেন, 'ডিসপেপশিয়া এখনও আছে বলে কিছুতেই তো স্বীকার করে না।'

বীথিকা হেসে বলল, 'নিজের রোগ কি কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় মা? এ ব্যাপারে মরালিস্ট ইম-মরালিস্ট সবাই আমরা সমান।'

মুখের মধ্যে আবার পেস্টের সাদা ফেনা জমেছিল। বীথিকা এবার উঠে বাথরুমে চলে গেল। মুখ ধুয়ে নীল পাড়ের সাদা খোলের একখানা আটপৌরে শাড়ি পরে ফের এসে বসল মায়ের পাশে। এবার বেশ উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে বীথিকাকে। গড়ন অনেকটা মায়ের মত হলেও গায়ের রঙ বাপেরই পেয়েছে বীথি। বরং শৈলেনবাবুর চেয়েও ওর রঙ সুন্দর। গৌরবর্ণের সঙ্গে একটু লালচে ছোপ মেশানো। চেহারার অন্য খুঁত এই রঙের গৌরবে ঢাকা পড়েছে। বীথিকার মুখে মায়ের মত বুদ্ধির দীপ্তি অতটা নেই, নেই অমন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ। কিন্তু এমন এক বাসনার তীব্রতা রয়েছে যা কম-বয়সী কি অসাবধানী পুরুষের মনে ওকে দেখা মাত্র সংক্রমিত হতে পারে।

বীথিকা মার দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলল, 'চিঠিটা তোমার পড়া হল মা? কি লিখেছেন পিসীমা?'

নীরজা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'কী আবার লিখবেন! সেই এক বাঁধা গৎ আছে: সেবাকে নাও, সেবাকে নাও। ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই এক কথা।'

বীথিকা মৃদু হেসে বলল, 'লিখবেন না তো কি করবেন! ওঁদের পক্ষে একটা প্রব্লেম তো বটেই।'

নীরজা বললেন, 'ওঁদের পক্ষে একটা প্রব্লেম, আমার পক্ষে অনেকগুলি। ভাল কথা, জয়ন্ত বুঝি কাল ফেরেনি?'

বীথিকা বলল, 'না, সে বোধ হয় তার বন্ধুর হোটেলে আছে। তার জন্যে ভেবো না মা। অন্য কোথাও গিয়ে থাকবার ছেলে সে নয়। তাছাড়া যত ড্রিঙ্কই করুক, ইনটক্সিকেটেড সে কখনো হয় না মা।'

নীরজা মুহূর্তকাল মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ছিঃ বীথি, জয়ন্ত তোর দাদা। তা তুই কি করে ভুলে যাস?'

বীথি বলল, 'আমি তো তা ভুলি নে মা। আমি যে জয়ন্তর ছোট বোন তাই বরং ও সময় সময় ভোলে। ও যত আমার নিন্দে করে, আমি তার সিকি পরিমাণও করি নে। শুধু ওর স্বভাবচরিত্রের বর্ণনা করি মাত্র।'

নীরজা অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বর্ণনা?' কণ্ঠের সেই মৃদুতার মধ্যেও একটু তিক্ত বিদ্বেষ ফুটে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বীথিকা বলল, 'ও কি মা, তুমিও যে বাবার মত রগ-চটা হলে। কোথায় চললে?'

নীরজা বললেন, 'যাই, চা-টার ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'চা তোমরা একবার খেয়ে নিয়েছ। আমিই বাকি। রুক্মিণীকে বলে দিয়েছি আমাদের চা আজ এখানে দিয়ে যেতে। তুমি বোসো মা। আমার কিছু কথা আছে।'

আশ্চর্য, বাধ্য মেয়ের মতই নীরজা বসে পড়লেন।

বীথিকার গলায় একটু যেন আদেশের সুর ছিল।

নীরজা বললেন, 'কি কথা?'

বীথিকা রেণুকণার লেখা চিঠিখানার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে পাতাগুলি উল্টে রেখে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, সেবাকে এখানে আনতে তুমি অত অমত করছ কেন? খরচ বেড়ে যাবে সেই ভয়ে?'

নীরজা জ্বলে উঠলেন: 'তুই কি আমাকে অতই হীন মনে করিস বীথি?'

বীথি বলল, 'না, তা করি নে। আর করি নে বলেই তো আমার কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা হেঁয়ালির মত লাগছে।'

কালো বেঁটে ধরনের একটি স্ত্রীলোক ট্রেতে করে চা ডিমসিদ্ধ মাখন রুটি আর দুটো মর্তমান কলা এনে সামনের নীচু গোল টেবিলটার ওপর রাখল।

রুক্মিণীর বয়স বছর তিরিশেক। বেশ শক্ত মজবুত চেহারা। রুক্মিণী বিধবা। আগে থান কাপড় পরত। কিন্তু বীথি তাকে ধমকে ফিতে-পেড়ে শাড়ি পরিয়েছে। কখনও কখনও আরও চওড়া-পেড়ে শাড়িও পরে। মেদিনীপুরের এই নিরক্ষরা ঝি-টিকে মেজে-ঘষে বীথিকা বেশ ঝকঝকে শহুরে করে তুলেছে। শুধু পানটা ছাড়াতে পারে নি। বড় বেশী পান খায় রুক্মিণী। বীথিকা শাসন করায় সে হাত জোড় করে কাতরভাবে বলেছে, 'দিদিমণি, নেশার জিনিস কেড়ে নিয়ো না। তা হলে বাঁচব না।'

বীথিকা ওর ভঙ্গী দেখে হেসে বলেছে, 'তা ঠিক। নেশাই তো জীবন। না কি জীবনই একটা নেশা।'

খাবার রেখে রুক্মিণী যাওয়ার আগে বলল, 'দিদিমণি, আর কিছু লাগবে?'

বীথিকা পরিহাসতরল কণ্ঠে বলল, 'না দিদিমণি, আর কিছু লাগবে না। আমাদের কি রাক্ষসী ভেবেছ?' অবশ্য ও না ভাবলেও কেউ কেউ ভাবে, রাক্ষসী পিশাচী। 'বাংলা ভাষায় এ ধরনের আর কি গালাগাল আছে বল না মা।'

নীরজা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি জানি নে।' তারপর চায়ের কাপটি নিজের দিকে টেনে নিলেন।

বীথিকা বলল, 'ও কি, শুধু চা নিচ্ছ কেন মা, খাবার নাও। ডিম নাও, রুটি নাও। রুক্মিণীর মত তুমিও কি ভেবেছ অতগুলো খাবার আমি একা খাব?'

নীরজা বললেন, 'আমি খেয়েছি। তুই যা পারিস খেয়ে নে।'

বীথিকা বলল, 'মিথ্যে কথা। তুমি অত সকালে চা ছাড়া কিছু খাও না। আমি তা জানি। তোমাকে খেতে হবে। তুমি না খেলে আমিও কিছু খাব না মা।'

বলতে বলতে বীথিকা চামচে করে খানিকটা ডিম তুলে মায়ের মুখের সামনে ধরল।

নীরজা লক্ষ্য করলেন, তাঁর মেয়ের চোখে মুখে কি গলার স্বরে এই মুহূর্তে কোন কৃত্রিমতার ছাপ নেই। তাঁর অভিনেত্রী মেয়ের এটুকু যে অভিনয় নয় তা চিনতে পেরে নীরজা খুশী হলেন। একটু হেসে বিব্রত ভঙ্গীতে বললেন, 'কি যে পাগলামি করিস! এই বাইরের ঘরে খাবারগুলি আনিয়ে নিলি। কেউ যদি এসে পড়ে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'ও, তুমি সেই ভয় পাচ্ছ? এখন তো সবে নটা। এত সকালে আমাদের বাড়িতে কেউ আসবে না মা। সবাই জানে এগারটাব আগে আমাদের ভোর হয় না, আর আমরা সকালে কাউকে রিসিভ করি নে।'

নীরজা খেতে খেতে বললেন, 'কিন্তু তোর বাবার তো সেই সাড়ে চারটেয় ভোর। তার কাছে তো কেউ কেউ আসতে পারে?'

বীথিকা হেসে বলল, 'জান না বুঝি, বাবাও আজকাল তাঁর কোন বন্ধু কি পুরনো ছাত্রছাত্রীকে বাড়িতে ডাকেন না। দেখা-সাক্ষাতেব জন্য তিনি অন্য ব্যবস্থা করেছেন।'

নীরজা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'তাই নাকি?' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তার কাবণ কি জানিস? আমরা যে তার আপন জন এ কথা সে বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করতে চায় না, সে আমাদের রীতিমত ঘৃণা করে।'

বীথিকা বলল, 'আর আমরা তাকে অবজ্ঞা করি। শোধবোধ হয়ে যায় মা। তোমার আপসোস করবার কিছু নেই।'

নীরজা কোন জবাব না দিয়ে পাঁউরুটিতে মাখন মাখিয়ে খেয়ে চললেন।

বীথিকা তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে ফের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এবার সেবাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হয় মা।'

নীরজা বললেন, 'কি করে মেটাবি? কি করতে চাস তুই?'

বীথিকা বলল, 'এ ব্যাপারে বাবা যা চান আমিও তাই চাই। সেবা এখানে এসে থাকুক না কিছুদিন। কী এমন ক্ষতি হবে! দেখ, যদি স্বাভাবিক অবস্থা হত আমি তোমাকে এমন পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু বেচারার ওপর দিয়ে কি অত্যাচার গেছে তাই একবার ভেবে দেখ মা। গুণ্ডারা ওর দেহ নিয়ে যা করেছে, পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনেরা ওর মন নিয়ে তাই করছে। লাঙলের ফলা দিয়ে ওকে একেবারে চষে ফেলছে; পিসীমা নিতান্ত বিপন্ন হয়েই আমাদের এখানে ওকে রাখতে চাইছেন।'

নীরজা বললেন, 'হ্যাঁ, বিপদে না পড়লে সে কারও কাছে ঘাড় নোয়াবার মত মানুষ নয়।'

বীথিকা বলল, 'তবেই দেখ। এ অবস্থায় আমরা যদি ওকে আশ্রয় না দিই, তার মানে হবে কি জান? আমরা যতই ফরওয়ার্ড বলে নিজেদের জাহির করি ভিতরকার রক্ষণশীলতা আমাদের যায় নি। আসলে আমরাও মনে করি—ওর জাত গেছে, ওর সব গেছে। ওকে ঘরে স্থান দেওয়া যায় না।'

নীরজা প্রতিবাদ করে উঠলেন: 'কিন্তু তুই তো জানিস আমি অত নীচ নই। ওসব সংস্কারের বালাই নেই আমার।'

বীথিকা বলল, 'সে কথা আমি জানি। কিন্তু বাইরের লোকে তো তা বুঝবে না মা। তারা অন্যরকম ভাববে। কিন্তু আমি তা ভাবতে দিতে রাজী নই। এমন কি বাবা যে ভাববেন আমরা খরচের ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি তাও আমি হতে দেব না।'

নীরজা চা শেষ করে কাপটা একটু সরিয়ে রেখে বললেন, 'খরচের ভয়ও নয়, জাত যাওয়ার ভয়ও নয়। আমি অন্য রকমের ভয় করছি বীথি।'

বীথিকা মার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করল: 'ভয়! কিসের ভয় মা? তোমাকে তো বীরাঙ্গনা বলেই জানি। তুমিও ভয় ভয় করছ।'

নীরজা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'দেখ্ বীথি, সব সময় অমন ঠাণ্ডা ইয়ারকি করিস নে। আমি তোর মা। তোদের থিয়েটার-সিনেমার সাজানো মা নয়, সত্যিকারের মা।'

বীথিকা বলল, 'কে তা অস্বীকার করছে! কিন্তু মা, তোমার আর বাবার মধ্যে যত ঝগড়াঝাঁটিই হোক, তোমাদের মধ্যে যত অমিলই থাকুক, তুমি আসলে বাবার সত্যিকারের সহধর্মিণী। দুজনেই প্রায় সমান টাচি। স্পর্শ করলেই কাতরাতে থাক।'

নীরজা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন, তার পর তিরস্কারের স্বরে বললেন, 'বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বীথি। আমাকে সত্যি করে বল্, কাল তুইও কি তোর দাদার পথ ধরেছিলি?'

বীথিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না মা। তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি। মেজাজটা আমার অমনিতেই আজ বড় হালকা হয়ে আছে। জীবনটা এক এক সময় যত ভারি মনে হয় আমি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তত হালকা হয়ে যাই।' 'গভীর স্বরে গভীর কথা বলতে তোরে সাহস নাহি পাই।'

কবিতার কলিটুকু আবৃত্তি করেই বীথিকা সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটল। তার পর বলল, 'আমায় মাফ কর মা।'

নীরজা গম্ভীর হয়ে রইলেন। কাল থিয়েটার ছিল বীথিকার। নিশ্চয়ই দু-এক পেগ পেটে পড়েছে। তার জের এখনও কাটে নি। ও যত শপথই করুক, নীরজা ওর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেন না।

নীরজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুই-ই বরং আমাকে মাফ কর্ বীথি। যাই এবার। কাজকর্ম দেখি গিয়ে।'

বীথিকা তাড়াতাড়ি মায়ের হাত টেনে ধরল: 'না না মা, বোস। রাগ কোরো না। সেবার ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা যাক। তুমি যে ভয়ের কথা বলছিলে, কিসের ভয়?'

নীরজা বললেন, 'সে কথা এখন তোর সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। তুই এখন অন্য মুডে আছিস।'

বীথিকা বলল, 'না মা, আমি ঠিক মুডেই আছি। তুমি বল।'

নীরজা বলতে লাগলেন, 'দেখ্, সেবার ওপর আমারও যে মায়া হয় না তা নয়। কিন্তু ওদের চাল-চলন ধরন-ধারন এক রকম, আমাদের অন্য রকম।

এখানে এসে ওর কষ্ট হবে। এখানে এসে সে তোকেও ঘৃণা করবে, আমাকেও ঘৃণা করবে। আমি তা সইতে পারব না বীথি।'

বীথিকা বলল, 'কি আশ্চর্য! তোমার এক ধরনের ইন্‌ফিরিয়রিটি কম-প্লেক্স্ জন্মে গেছে মা। ওই এক ফোঁটা মেয়ে। সে তোমাকে পার পাবে ভেবেছ? তাকে আমরা টুঁটি টিপে মেরে ফেলব না; তা ছাড়া তার থোঁতা মুখও ভোঁতা হয়ে গেছে। তারই বা সমাজে এখন সম্মান কোথায়? লোকে তাকে দয়া করে, অনুকম্পা করে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে সাধ করে ইচ্ছে করে তাকে ঘরে নেয় না। পিসীমার চিঠিপত্রগুলো আমি তো সব পড়ে দেখেছি। আমার আর বুঝতে কিছু বাকি নেই মা। ওরা খুবই বিপদে পড়েছে।'

নীরজা বললেন, 'হ্যাঁ, বিপদে পড়েছে বলেই আজ আমাকে এত সাধা-সাধি করছে। নইলে ওই রেণু! তুই কিছু জানিস নে বীথি। জগৎটা অত সোজা নয়।'

বীথি একটু হেসে বলল, 'জগৎটা যে অষ্টাবক্র তা আমার জানতে বাকি নেই মা।'

নীরজা বলতে লাগলেন, 'ওই রেণু আমার কি কম নিন্দা করেছে? গোড়া থেকেই ও আমাকে দেখতে পাবত না। আমরা ফিরিঙ্গি, আমরা ট্যাঁস, আমরা—। কী না বলেছে! বছর তিনেক আগে ও বাগবাজার এসেছিল। ওর কাকার বাসায় বেড়াতে। কত নিন্দে-মন্দ করে গেছে। আমাদের সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করতে আসে নি। পাছে জাত যায়। আজ নিজের যখন জাত গেছে তখন এসেছে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে। স্বামীর ঘর ছেড়ে তুই থিয়েটার সিনেমা করে বেড়াচ্ছিস বলে তোর নামেও কি কম রটিয়েছে রেণু? আমার সব কানে গেছে। যাতে কানে যায়, যারা আমার কানে দেবে তাদের কাছে ও ইচ্ছে করে জেনে শুনে ওসব কথা বলেছে। আমি কি তা সহজে ভুলব?' গলার স্বরে চাপা রাগ আর উত্তেজনা ফুটে উঠল নীরজার।

বীথিকা আস্তে আস্তে বলল, 'ভুলব কেন মা! বরং সে সব কথা মনে

রেখেই সেবাকে আমরা এখানে আসতে বলব। মহত্ত্ব দেখাবার এমন সুযোগ আর পাবে না মা। শুধু রেণুপিসীর কাছে নয়, বাবার কাছেও। তা হলে বাবাকে বলে আসি আমাদের মতটা? উনি আবার অফিসে বেরিয়ে যাবেন।'

নীরজা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'কর তোমার যা ইচ্ছে। কিন্তু আমার আপত্তির আরও অনেক কারণ ছিল।'

বীথিকা হেসে বলল, 'আরও কারণ? কয়েকটা তো বললে। আচ্ছা বাকি কয়েকটাও শুনি।'

নীরজা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বাইরের কাউকে নিজেদের সংসারভুক্ত করে রাখার আরও অসুবিধে আছে। নিজেদের কোন প্রাইভেসি থাকে না।'

বীথিকা মৃদু হেসে বললে, 'ও প্রাইভেসি! বড়লোকের বাড়ির ঠাকুর চাকর ড্রাইভার দারোয়ান বেয়ারা তাদের মনিবের হাঁড়ির খবর জানে। তা নিয়ে বাইরে বলাবলি করতেও তারা ছাড়ে না। তাতে কি মনিবের প্রাইভেসি নষ্ট হয়? এই ধর রুক্মিণী। ও না জানে কি! লেখাপড়া না জানলে কি হবে। ভারি সেয়ানা মেয়ে। সব বোঝে। কিন্তু তাতে কি এসে-যায় মা। সেবাও তেমনি হবে। যতই জানুক বুঝুক শেষ পর্যন্ত ও আমাদেরই একজন হয়ে যাবে। ভেবেছি শিখিয়ে পড়িয়ে ওকে আমি প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নেব। সেবা ঘরের কাজ করবে। রুক্মিণী বাইরের ফুটফরমায়েশ খাটবে।'

নীরজা গম্ভীরভাবে বললেন, 'কর, তোমার যা ইচ্ছে। তুমিই যখন আজকাল বাড়ির কর্ত্রী। সংসারের বেশীর ভাগ খরচ যখন তুমিই দিচ্ছ—'

বীথিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ছিঃ মা! এ কিন্তু ঠিক সত্যিকারের মায়ের মত কথা হচ্ছে না। এমন কি থিয়েটারের সাজানো মার মতও নয়। থিয়েটারেও আমরা সংসারের সাজেই সাজি। আমার রোজগার কি তোমারও নয়? তুমি যদি আমাকে বাবার মত তাড়িয়ে দিতে, আমি কোথায় ভেসে যেতাম। তুমি আমার ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে

সাহায্য করেছ। তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ, স্নেহ করেছ, শত দোষ ত্রুটি মার্জনা করে ভালবেসেছ। তোমার ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারব না।'

নীরজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'থাক্ বীথি, থাক্। এটা তোর স্টেজ নয়।'

বীথিকা বলল, 'আবার ও-সব কথা বলছ? সেক্সপীয়ার বলে গেছেন—গোটা তুনিয়াই একটা স্টেজ। সবাই সে কথা মনে রাখতে পারে না। কিন্তু স্টেজ যাদের কাছে সংসার তাদের কাছে সংসারটা আপনা থেকেই স্টেজ হয়ে ওঠে মা। যাই বাবাকে সেবার কথাটা বলে আসি গিয়ে। তিনি খুশী হবেন।'

শৈলেনবাবু মাথায় তেল মেখে গামছা কাঁধে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, বীথিকা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

'বাবা!'

একটু আগে এই অবাধ্য মেয়েটির প্রগল্‌ভতায় বিরক্ত এমন কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ, ভেবেছিলেন আবার দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে মধুর কোমল কণ্ঠের পিতৃসম্বোধনে খানিক আগের সঙ্কল্প ভুলে গেলেন। থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি বল?'

বীথিকা বলল, 'বাবা, পিসীমার চিঠিখানা পড়লাম। সেই সঙ্গে সেবার নিজের হাতে লেখা তুটি লাইন পড়ে ভারি কষ্ট হল। গাঁয়ের বাড়ি। ওই সব কাণ্ড-কারখানার পর নিশ্চয়ই ওখানে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তুমি যদি বল ওকে আসতে লিখে দিই বাবা।'

মেয়ের মনে কি আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা যেন শৈলেনবাবু দেখে নিতে চাইলেন। বীথিকার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বীথি নির্ভয়ে অসংকোচে নিজেকে দেখতে দিল। অনেকের অনেক রকম দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অতিরিক্ত শাসনের দৃষ্টিই হোক, স্নেহের দৃষ্টিই হোক কিছুই তাকে সহজে বিচলিত করতে পারে না।

শৈলেনবাবু বললেন, 'আমি তো অনেক দিন ধরেই সে কথা বলে আসছি। কিন্তু তোমরা তুই মা মেয়ে—'

বীথিকা হেসে বলল, 'বাবা, কারণে হোক অকারণে হোক মাকে তুমি

কিছুতেই একটু খোঁচা না দিয়ে পার না। অনেক অসুবিধার কথা ভেবেই মা প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সেঁবা তো পরিষ্কার করে কিছু লেখে নি, পিসীমার অত বড় লম্বা চিঠিতেও সব কথা বোঝা যায় না। ফের যদি কোন শত্রু ওদের পিছনে লেগে থাকে, কি আবার সেই ধরনের কোন বিপদ-আপদ হয় তা হলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না। তার চেয়ে আমি বরং তোমার নাম করে পিসীমাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিই।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'টেলিগ্রাম!'

বীথিকা বলল, 'হ্যাঁ, ওঁরা তো খুবই দুর্ভাবনায় আছেন। টেলিগ্রামই ভাল। এখান থেকে কাউকে পাঠানো তো সম্ভব হবে না। তোমার অফিস আছে। তা ছাড়া যা শরীর। অত কষ্ট করে তুমি যেতে পারবে না। তার চেয়ে লিখে দিই, পিসেমশাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। কি বল?'

আর এক মুহূর্ত বাবার দুটি তীক্ষ্ণ চোখের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে বীথিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। আজকাল স্ত্রী আর মেয়ের সহজ কথাকেও সহজভাবে নিতে পারেন না শৈলেন্দ্রনাথ। ওদের সব কথা, সব কাজের পিছনে গোপন অভিসন্ধি অনুসন্ধান করেন।

একটু বাদে তিনি বললেন, 'বেশ। কিন্তু টেলিগ্রামটা যেন সত্যিই করা হয়। তোমরা না বললেও আমি আজ রেণুকে চিঠি লিখে দিতাম, এ বাড়িতে আমার কিছু অধিকার আছে।'

বীথিকা বলল, 'কিছু কেন বলছ? এ বাড়ির সব অধিকারই তোমার। তোমার নামেই ভাড়া দেওয়া হয়। তুমি ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার। তোমার যদি ইচ্ছে না হয় বাবা, তা হলে বলে দাও আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকি।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'থাক্ থাক্। জয়ন্ত বুঝি কালরাত্রে আর ফেরেনি।'

বীথিকা বলল, 'না।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'চমৎকার! দেখ গিয়ে হয় খানায় পড়ে আছে, না হয় নর্দমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। না হয় তার চেয়েও খারাপ জায়গায়। তোমরা তিনজনে মিলে বাড়িটিকে চমৎকার নরক বানিয়ে তুলেছ।'

বীথিকা এই অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে শান্তভাবে বলল, 'বাবা, দাদা কাল বেরুবার আগেই বলে গিয়েছিল শুভেন্দুবাবুর ওখানে তার নেমন্তন্ন আছে। সে রাত্রে আর ফিরবে না।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'শুভেন্দু! ওই আর একজন। আমার সংসারের পক্ষে সবচেয়ে অশুভগ্রহ। সে একাই তোমাদের তিনজনের মাথা খেয়েছে।'

বীথিকা বলল, 'বাবা, অনর্থক পরের দোষ দিয়ে কি হবে! দোষ যদি কারও থাকে সে আমাদের নিজেদের। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা। তুমি নাইতে যাও।'

অফিসের কথাটা মনে পড়ায় শৈলেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বাথরুমের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে নীরজা সবই শুনেছিলেন। স্বামী সরে যাওয়ার পর তিনি এবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তীব্রকণ্ঠে বললেন, 'তোর কিছুতেই শিক্ষা হল না বীথি। বাপের কাছে তো খুব সোহাগ জানাতে গিয়েছিলি? পেলি সোহাগ? সাধে কি আমি কোন কথা বলি নে? কথা বললেই অশান্তি। কথা বললেই ঝগড়া। তেতো কথা ছাড়া লোকটির মুখে আর কোন কথা নেই। আজ বলে নয়। চিরটা কাল আমাকে একভাবে জ্বালাচ্ছেন। কথার বিষে সারাটা জীবন আমার জর্জর হয়ে গেল বীথি, আর আমি সইতে পারি নে। আর আমি সইবও না।'

বীথি বলল, 'থাম মা, থাম। আবার তোমাদের তুমুল ঝগড়া লেগে যাবে।'

নীরজা বললেন, 'লাগুক। ও তো লেগেই আছে। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তুই সেবাকে এখানে আনতে চাস? ভেবে দেখ্, এখনও ভাল করে ভেবে দেখ্। এসব সত্ত্বেও কি তুই—'

বীথিকা বলল, 'হ্যাঁ মা, এ সব সত্ত্বেও তাকে এখানে আনতে হবে। তার অশান্তি আমাদের অশান্তির চেয়ে ঢের বেশী।'

৪

স্নান শেষ করে ভিজে কাপড় ছেড়ে সন্থ পাটভাঙা ধুতি পরতে পরতে গীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন শৈলেন্দ্রনাথ :

"ধ্যায় তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

বাংলায় কাশীদাসী মহাভারতেও আছে—'ক্রোধ সম পাপ দেখি, না দেখি সংসারে।'

সম্প্রতি শৈলেনবাবুর আত্মসমালোচনায় বড রিপু ধরা পড়েছে এই ক্রোধ। ক্রোধকে জয় করতে হবে। দমন করে রাখতে হবে এই দ্বিতীয় রিপুকে। মন্ত্রের মত দিনের মধ্যে বহুবার এই সঙ্কল্পেব আবৃত্তি করেন শৈলেনবাবু। মনে হয় মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গ বুঝি শান্ত হল। কিন্তু এর চেয়ে বড় বিভ্রান্তি আর নেই। কোন্ উপলক্ষে সে যে ফণা তুলে দাঁড়াবে তা আগে থেকে বলা যায় না, মনের মধ্যে স্তূপাকৃতি বারুদ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। শুধু আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গেব অপেক্ষা। কিন্তু এই সংসাবে অগ্নিবৃষ্টির কি বিরাম আছে? উত্তেজনার উপলক্ষ দিনের মধ্যে বহুবার ঘটবে। সংযমের বর্মে সেই অঘটনকে বার বার নিবারণ করতে হবে। সেই তো সাধনা। আধুনিক কালের তপস্যা অরণ্যে নয়, জনারণ্যে—এই বস্তুপুঞ্জের মধ্যে।

হজমের গোলমাল হয় বলে খুব কম করে খান শৈলেনবাবু। দরকার হলে তাড়াতাড়িও খেতে পারেন। খাওয়া শেষ করে অফিসে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে তাঁর পনের-কুড়ি মিনিটের বেশী লাগে না। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে একটি চাদর, পায়ে নিউকাট পাম্প-শু, কখনো-সখনো

আওয়াল। অফিস, সভাসমিতি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন উপলক্ষে কোথাও এই সাজ-সজ্জার ব্যতিক্রম ঘটে না। শুধু আজ নয়, প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর এই আটপৌরে অনাড়ম্বর বেশ। মাঝে মাঝে নীরজা এই নিয়ে কত গঞ্জনাই না দিয়েছেন : 'দেখ, তোমার ওই একরঙা সাদা পোশাক দেখতে দেখতে আমার চোখ ক্ষয়ে গেল। তুমি ধরনধারনটা একটু বদলাও।'

শৈলেনবাবু হেসে জবাব দিতেন, 'ধারন বদলালেই কি ধরন বদলাবে? পোশাকটা নিতান্তই বাইরের ব্যাপার। এর ওপর অত জোর দিচ্ছ কেন?'

নীরজা বলতেন, 'থাক্ থাক্। কেবল উপদেশ আর উপদেশ। মনের মধ্যে রঙ নেই, রস নেই, মুখভরা কেবল নীতিকথা। যেন এক বুড়ো ঠাকুরদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। ঠাকুরদারাও এমন অরসিক হন না। তাঁরাও নাতনী-নাতবউয়ের সঙ্গে রঙ্গরস ঠাট্টাতামাসা করে থাকেন। তোমার সেটুকুও নেই।'

রঙ আর রস। রঙ আর রূপ। শৈলেনবাবুর মন যখন প্রশান্ত প্রকৃতিস্থ থাকে নিজের স্ত্রীর ওপর তাঁর অনুকম্পা হয়, সহানুভূতি জাগে। সত্যিই তো, যে কোন কারণেই হোক এই নারীর রঙের সাধ, রূপের সাধ, রসের সাধ তিনি মেটাতে পারেন নি। জীবনযাত্রার উপকরণের বাহুল্যকে তিনি চিরকাল অপছন্দ করে এসেছেন। মানুষের চার দিকে এই যে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু, অশন বসন ভূষণের নামে এই যে স্তূপীকৃত উপকরণসম্ভার, শৈলেনবাবুর মতে শরীরের মেদবাহুল্যের মতই জীবনের পক্ষে তা দুর্বহ ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। যে মানুষ স্রষ্টা, যে মানুষ কল্যাণকর্মী, যে মানুষ ভাবুক চিন্তাচারী, এই উপকরণস্ফীতি তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। সে যে সব সময় ইচ্ছা করে এগুলি বাদ দেয় তা নয়। চিন্তার উচ্চ মার্গে উঠতে শুরু করলে এই বস্তুপুঞ্জ আপনিই বাদ পড়ে। সে আপনিই লঘুপক্ষ হয়ে ওঠে। সেই পাখায় উপকরণের এই বাহুল্য বয়ে নেওয়া যায় না। বয়ে নেওয়ার কথা মনেও থাকে না। যে মানুষ আত্মভোলা হয়ে সত্যিই নিজের ভাগিদে কবিতা লেখে, কি গভীর কোন দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকে, তার দুই গালের

প্রাপ্তি আপনিই বড় হয়ে ওঠে, বেশে-বাসে পারিপাট্য লোপ পায়। তার ঔদাসীন্ত, তার নিস্পৃহা ভান নয়, ভোল নয়, এমন কি অক্ষমতাও নয়; এইটুকু মাত্র বলা যায়, ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র তার ভিন্নতর।

নীরজার পক্ষের কি বলবার কথা তাও শৈলেনবাবু জানেন। নীরজা বলেন, 'আমি কবি নই, দার্শনিক নই, চিন্তাশীল নই। আমি সাধারণ মানুষ। আমার সব চাই। রূপ-রস-স্বাদ-স্পর্শে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতেই আমার পরিতৃপ্তি।'

ও-দলের বক্তব্য শৈলেন্দ্রনাথের অজানা নয়। তাঁরা বলবেন, মানুষের এই ভোগের স্পৃহা, সুখের তৃষ্ণাই তো তাকে কর্মতৎপর করেছে, সন্ধানী করেছে, বিজ্ঞানী করেছে। মানুষ যদি তার উপকরণ না বাড়াত, বার বার উপকরণ না বদলাত তা হলে সে তো সেই পোড়ামাটি আর পাথরের যুগেই থেকে যেত। সভ্যতা সংস্কৃতি পদে পদে এগিয়ে আসত না। উপকরণ নেই কার? উপকরণ নেই পশুর। যে এসেছে নেংটা, যাবে নেংটা, থাকবেও নেংটা। কিন্তু সেই আসা-যাওয়ার নগ্নতার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। মাঝখানকার এই গণ্ডগোলের মধ্যেই মানুষের জীবন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবপত্র, তার ভোগসম্ভোগ হাটবাজার, কলকারখানা হাজার রকমের কোলাহল কলরোলের মধ্যেই তার সন্ধান সাধনা সিদ্ধি সার্থকতা। তা যদি না হত, বন থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগর হত না। মানুষ শুধু বনমানুষ হয়েই থাকত।

যাকে তুমি বাহ্য উপকরণ বলছ তা কি শুধু মানুষের দুখানি হাতের সৃষ্টি? তার মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয়, মনের সৃষ্টি নয়? তার সাধ-আহ্লাদ, স্বপ্ন, তার সৃষ্টির আনন্দ, চেয়ে দেখ প্রত্যেকটি উপকরণকে রঞ্জিত করেছে। প্রত্যেকটি বাহ্যবস্তু, ভোগ্যবস্তু, যুগ-যুগান্তর ধরে কত মানুষের ত্যাগসাধনা, অধ্যবসায়, তপশ্চর্যার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তার পিছনে দুখানি হাত ছাড়া কিছুই নেই—এ কথা বলে তুমি তাকে দু পায়ে দলতে পার না।

আর কিই বা উপকরণ নয়? তোমার কাব্যসাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সবই উপকরণ। একজন নিরক্ষর চাষীর পক্ষে এগুলিও তো বাহ্য, বাহুল্য,

নিজেকে[illegible]। স্ত্রী-পুত্রকে ভালবেসে অনাড়ম্বর সুখের জীবন যাপন করতে হলে এই মানসসৃষ্টির ভোগ-সম্ভোগেরও তো কোন প্রয়োজন নেই! কিন্তু তুমি কি ফিরে যাবে সেই নিরক্ষরতায়, না কি সারা দেশকে অজ্ঞতার আনন্দে ভুলিয়ে রাখবে? তোমার কাব্য-সাহিত্য যত উচ্চস্তরের উপকরণই হোক, তার মধ্যেও কামগন্ধ আছে, দেহগন্ধও আছে। সে ভোগ, সে সুখও দেহের মাধ্যমে। যাকে তুমি মন বলছ, আত্মা বলছ, তাও এক ধরনের সূক্ষ্মদেহ, দেহের নির্যাস ছাড়া কিছু নয়। মানুষ যেমন স্বর্গকে মর্ত্যের আদর্শে গড়েছে, আত্মাকেও তেমনি দেহের স্বভাব দিতে ছাড়ে নি। ঈশ্বরকে যতই নিরাকার করে গডতে গেছে, নাস্তিত্বে নামিয়ে এনেছে, ততই গুরু ঋষি, পীর পয়গম্বর, রাজনৈতিক নেতা, ডিক্টেটরদের আকারে বহু দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। অবয়বহীন বস্তুহীন প্রাণ মানুষের কল্পনার বাইরে। বস্তুকে অস্বীকার করা মানে প্রাণ-বস্তুকেই অস্বীকার করা।

নিজের মনের মধ্যে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে শৈলেন্দ্রনাথের। মীমাংসা আর হয় না। তিনি অন্যমনস্কভাবে বাড়ি থেকে বেরোন, ট্রামে ওঠেন, অফিসে পৌছান। এগুলি তাঁর কাছে শারীরিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়।

শৈলেনবাবুর অফিস এক হিসেবে তাঁর মনোমত জায়গায়। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, কি মার্চেণ্ট অফিস, কি সরকারের কোন প্রশাসন বিভাগে নয়; জাতীয় গ্রন্থশালায়। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ানদের তিনি একজন। এ কাজে পদ-গৌরব আছে, আত্ম-গৌরব আছে, বেতনও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। কলেজের সাফল্যহীন অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে এই বিশাল গ্রন্থশালায় এসে তাই প্রথমে পরমতৃপ্তিই পেয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর ভুল ভাঙল। এও চাকরি। এখানেও হিসাব-নিকাশ, চিঠিপত্র লেখা, বাইরের নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, বিভাগীয় শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বপালন, এমন হাজার রকমের কাজ আছে, শৈলেনবাবু যাকে নিতান্তই বহিরঙ্গ বলে ভাবেন। '**water, water everywhere, not a drop to drink**'—এই বিশাল গ্রন্থশালায় তিনি জ্ঞান-পিপাসা কি

রস-পিপাসা মেটাবার জন্যে আসেন না। এখানে বইয়ের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তা নিরক্ষর কি স্বল্পাক্ষর দপ্তরীর সম্পর্ক ছাড়া কিছু নয়। এই নিয়ে শৈলেনবাবু মাঝে মাঝে আপসোস করেন। যে সব ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যার্থী, জ্ঞানার্থিনী এখানে পড়তে আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে, গবেষণার সাহায্যের জন্যে উদ্ধৃতি আর মন্তব্যে পাতার পর পাতা ভরে ফেলে, তাদের মাঝে মাঝে ঈর্ষা করেন তিনি। এখানে তাঁর পড়াশুনার অবকাশ নেই, চিন্তা করবার অবসর নেই, নিজের ভাবনাধারাকে লিপিবদ্ধ করে রাখবার সুযোগ নেই। এখানে তিনি শুধু কর্মব্যস্ত চাকুরে, বিভাগীয় উপকর্তা। নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে অধস্তন কর্মচারীদের খবরদারিতে এখানে তাঁর সময় কাটে। এই বিরাট জ্ঞানভবনে তিনি তকমা-আঁটা প্রহরীমাত্র।

নিজের ছোট চেম্বারে ঢুকে খানকয়েক জরুরী চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে, জন দুই অধস্তন সহকর্মীকে দরকারী উপদেশ নির্দেশ দিয়ে কখন যে নিজের পারিবারিক সমস্যায় মগ্ন হয়ে পড়লেন শৈলেনবাবু, তা তিনি টেরও পেলেন না। পেলে হয়তো বিবেকে বাধত। অফিসের সময় নষ্ট করছেন বলে নিজেকে ধিক্কার দিতেন, তিরস্কার করতেন।

সেবাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন শৈলেনবাবু। নিজের বাড়িতে ওকে আনা উচিত হবে কি না সে সম্বন্ধে তিনিও দ্বিধাগ্রস্ত। আর সেই জন্যেই এতদিন কোন ব্যবস্থা করেন নি। নীরজার কাছে লেখা রেণুর চিঠিগুলি তিনি দেখেছেন, পড়েছেন। নীরজা জবাব না দিলেও তিনি নিজেই জবাব দিতে পারতেন। কারণ, রেণু জবাব তো সত্যি সত্যি শৈলেনবাবুর কাছেই চেয়েছে। আর এখনও ছেলে আর মেয়ের উপার্জনের তুলনায় তাঁর রোজগার কম হওয়া সত্ত্বেও শৈলেনবাবুই বাড়ির কর্তা। তবুও রেণুকে এতদিন তিনি কোন সদুত্তর দেন নি। যে পরিবেশ, যে আবহাওয়া তাঁর বাড়ির, তাতে সেবার মত একটি সুশীলা ধর্মভীরু গাঁয়ের মেয়েকে এখানে এনে রাখা কি সঙ্গত হবে? অবশ্য সেখানে সে একবার ধর্ষিতা হয়েছে। কিন্তু অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছে। গ্রামের সমস্ত লোকের সহানুভূতি

সেবাদের ওপর। ওরা যত ভ্রূকুটি করুক আর কোন অত্যাচার নির্যাতন হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু নিজের বাড়িতে এনে ওর মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা কি পুরোমাত্রায় রাখতে পারবেন শৈলেনবাবু? যে বাড়ির ছেলে অতিমাত্রায় মগুপ, মেয়ে শুধু স্বামীত্যাগিনী নয়, যৌননীতি আর সংযমের বাঁধকে যে উপহাস করে, পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় যার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, নিজের দুর্নামকে যে একটুও ভয় করে না, বাপের সুনামকে যে হেলায় নষ্ট করে, যে বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গে কর্তার জীবনাদর্শের আকাশ-পাতাল তফাত, যে মা ছেলেমেয়েকে প্রশ্রয় দিতে দিতে, ভোগবাদে দীক্ষা দিতে দিতে আয়ত্তের বাইরে ঠেলে দিয়েছেন, সেই পরিবেশে তাদের সাহচর্যে, সান্নিধ্যে সেবার মত মেয়েকে নিয়ে আসা কি সঙ্গত হবে? রীতি-নীতি-শাসন-সংযম-হীন ভোগবাদের বন্যা থেকে শৈলেনবাবু কি সেবাকে রক্ষা করতে পারবেন? তিনি কতটুকু সময় আর বাড়িতে থাকেন? খাওয়ার সময় আর ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া বেশীর ভাগ কালই তাঁর বাইরে বাইরে কাটে। ছুটির দিনেও হয় বেরিয়ে পড়েন, না হয় নিজের ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। স্ত্রীর আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সামান্য। তবু একই বাড়িতে একান্নভুক্ত আছেন বলে বার বার ওদের সংস্পর্শে আসতে হয়, আর সংস্পর্শ মানেই সংঘাত। শৈলেনবাবু যতই গীতার শ্লোক আবৃত্তি করুন, টেবিল-ক্যালেণ্ডারে, পকেটডায়েরির পাতায় অল্পবয়সী ছাত্রের মত নীতবচন উদ্ধৃত করে রাখুন, ক্রোধকে প্রধানতম রিপু বলে ধিক্কার দিন, সামান্য কিছু উপলক্ষ্য ঘটলেই দ্বেষে-বিদ্বেষে তা আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। তাঁর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে যদি কামে দগ্ধ হয়, তাঁকে দহন করে ক্রোধ। ষড়রিপুর দরকার হয় না, প্রাধান্য পেলে যে কোন একটি রিপুই মানুষকে অধঃপাতে টেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শৈলেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ভাবেন স্ত্রীপুত্রকন্যার সংস্রব ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তা হলে তাঁর মনের শান্তি এমন বার বার ব্যাহত হবে না, ক্ষণে ক্ষণে সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়বে না। কারণ বাইরের কারও সঙ্গেই তো তাঁর কোন বিরোধ নেই। সবাই তাঁকে শান্তশিষ্ট সৌম্য

স্বতন্ত্র বলে জানে। যত বিরোধ সংঘাত; তাঁর নিজের পরিবারের সঙ্গে। শৈলেন্দ্রনাথের কোন কোন বন্ধুও ঠিক ওই ধরনের পরামর্শই দিয়েছেন। বলেছেন, 'শৈলেন, তুমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে থাক। তাতে তুমিও শান্তিতে থাকবে, তাঁদেরও অশান্তি যাবে।' বন্ধুদের কথায় যেন নিজের ভাবনারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন শৈলেনবাবু। কিন্তু তাই বলে পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়তে পারেন নি। এইখানেই তাঁর দুর্বলতা ধরা পড়েছে। অন্য কোথাও চলে যাওয়ার প্রস্তাব করলেই ছেলে জয়ন্ত ধমক দিয়েছে: 'কি পাগলামি করছ? এই বাজারে আলাদা বাড়িভাড়া গোনার কোন মানে হয়?'

বীথিকা বলেছে, 'আচ্ছা বাবা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি কোনদিনই হবে না? তুমি অন্য বাড়িভাড়া করে থাকলে লোকে আমাদেরই বা কি বলবে আর তোমাকেই বা কি বলবে! যদি আমিই তোমার আপত্তির কারণ হয়ে থাকি, তা হলে বলে দাও, আমি আর কোথাও চলে যাই। তোমার যাওয়ার দরকার কি!'

নীরজা ধমক দিয়ে ওঠেন: 'ইস, এখন পর্যন্ত যে রাস্তা পারাপার হতে শেখে নি, কলকাতার বাসরুটগুলো পর্যন্ত চেনে না, এক বাসে উঠতে গিয়ে আর এক বাসে উঠে বসে, কোথায় নামবে ঠিক পায় না, সে আবার আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকতে চায়! শখ দেখ। ঘরের রান্না একটু এদিক-ওদিক হলে যার পাতের ভাত নড়তে চায় না,সে আবার হোটেলের রান্না খাবে! বললেই আমি বিশ্বাস করলাম আর কি। যার জামা-কাপড়ের খেয়াল থাকে না, চাবি আর চশমা ঘণ্টায় ঘণ্টায় হারায়, সে আবার চায় একা থাকতে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান গেছে বলে তো পৃথিবী সুদ্ধ মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায় নি।'

ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর এই আপাত-রূঢ় কথাগুলির মধ্যে নির্মম নীতিবাগীশ শৈলেন্দ্রনাথ কোথায় যেন এক দুশ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করেন। পা নড়ে তো মন নড়ে না। একটুখানি মাধুর্যের স্বাদ পেয়ে তাঁর মন আবার মৌচাক রচনা আরম্ভ করে। হয়তো এখনও আশা আছে। এই স্নেহ-প্রীতি-মমতার বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় হয়তো একদিন সব অপচয় নিবারণ করবে, সব ক্ষয় ক্ষতি পূরণ

করবে। একটি মাত্র রিপু যেমন সর্বনাশ করতে পারে, একটি মাত্র সদ্‌গুণও তেমনই মানুষকে অতল সমুদ্র থেকে তুলে আনতে পারে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো যদি পাপ হয় তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাও তো সেই মনুষ্য শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। শৈলেন্দ্রনাথের মনে পড়ে মদের ওপর অতিরিক্ত আসক্তি ছাড়া জয়ন্তের আর কোন মারাত্মক দোষ নেই। যে টাকা সে নষ্ট করে তা তার স্বোপার্জিত। বাকি টাকাটা অনেক দুঃস্থকে সে বিলিয়ে দেয়, বহু দরিদ্র আত্মীয় বন্ধুর পরিবারকে সাহায্য করে। শৈলেনবাবুর মতই জয়ন্তের চাল-চলন বেশবাসে কোন আড়ম্বর নেই। মেয়েদের সম্বন্ধেও অতিরিক্ত দৌর্বল্যের কোন পরিচয় এযাবৎ সে দেয় নি। এদিক থেকে সে প্রায় তার বাপের মতই। শুধু নেশার বস্তুতে ভেদ। শৈলেনবাবুর বই আর জয়ন্তের বোতল। এই দেহজ অভ্যাসকে সে কি কোনদিন ছাড়তে পারবে না? আর বীথিকা! সে ছেলেবেলা থেকে যত ইঁচোড়েপাকা, যত মুখফাজিল, আসলে তত খারাপ নয়। জীবিকার খাতিরে সে নানা ধরনের, নানা বয়সের পুরুষের সঙ্গে মেশে বটে, অনেকের সঙ্গে চোখাচোখা হাসিঠাট্টা চালায়, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাদের প্রত্যেককে সে দেহ দান করে। হয়তো কাউকেই করে না। জয়ন্তের যা নেই, বীথিকার তা আছে। পড়াশুনোর দিকে ঝোঁক আছে তার, বইটই অবসর মত পড়ে। অবশ্য তার বেশীর ভাগই গল্প উপন্যাস আর নাটক। তবু তো দিনের খানিকটা সময় পড়াশুনো নিয়ে কাটায়। তা ছাড়া ওরও হৃদয়ের ঔদার্য আছে। জানাশোনা মেয়েদের বিপদে আপদে বীথিকা অর্থ সাহায্য করে। কেউ মুখ ফুটে চাইলে পারতপক্ষে তাকে বিমুখ করে না। এ কথা শৈলেনবাবু জানেন। স্ত্রীর ওপরেও অবিচার করতে চান না তিনি। নীরজার সঙ্গে রুচি আর আদর্শগত অমিল থাকলেও গৃহকর্মে তাঁর নৈপুণ্য, তাঁর ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিমত্তাকে শৈলেনবাবু স্বীকার করেন। ছেলে-মেয়েকে নিজের পছন্দ-মত গড়ে তুলতে গিয়ে নীরজা যে ভুল করেছেন, মুখে স্বীকার না করলেও সেই ভুলের জন্য নীরজার মনে যে শান্তি নেই এ কথা মনের প্রশান্ত অবস্থায় শৈলেনবাবু বিশ্বাস করেন। ছেলেমেয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবন কোন মায়ের কাছেই কাম্য হতে পারে না। কি স্ত্রী হিসাবে, কি মা হিসাবে এই ব্যর্থ

নারীর জন্য মাঝে মাঝে শৈলেনবাবু অনুকম্পাই বোধ করেন। কোন বন্ধু তাঁর ছেলেমেয়ে কি স্ত্রীর নামে তীব্র ভাষায় অভিযোগ করলে শৈলেনবাবু তার মৃদু প্রতিবাদ করেন। ওদের আগাগোড়াই যে দোষ দিয়ে গড়া নয় সে কথা সবিনয়ে উল্লেখ করতে ভোলেন না। বন্ধুরা ভুল বোঝেন। তাঁরা হেসে বলেন, ‘শৈলেন, তুমি স্নেহান্ধ। তুমি ভেতরে ভেতরে দুর্বল। কঠোরতা তোমার ছদ্মবেশ মাত্র। তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সে কথা ভাল করেই জানে। তোমার দৌর্বল্যের সুযোগ তারা পূর্ণমাত্রায় নিয়েছে। তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ তার জন্যে তুমি নিজেই দায়ী। এ দুঃখ তোমার প্রাপ্য।’

বন্ধুদের এই বিরূপ সমালোচনায় শৈলেনবাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হন। তিনি অবশ্য কিছু বলেন না। তিনি জানেন ওরা যাকে দৌর্বল্য বলছে সেটা তাঁর নিরপেক্ষ বিচার মাত্র। শয়তানকেও তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে হয়। আর তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেবেন না? তিনি স্নেহান্ধ নন বলেই ওই সুবিচারটুকু করতে পাবেন। নিজের ছেলে আর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জীবনাদর্শেব এত অমিল বয়েছে বলেই নিরপেক্ষভাবে তাদের সপক্ষে দু-একটি সত্য কথা বলতে শৈলেন্দ্রনাথের চক্ষুলজ্জা হয় না। এ যেন বিধর্মী আর বিপক্ষের প্রতি সুবিচার। কিন্তু ‘একোহি দোষঃ গুণসন্নিপাতে’—। ওদের কিছু কিছু গুণ থাকলেই বা কি হবে! এক-একটি মারাত্মক দোষ প্রত্যেককে রাহুর মত গ্রাস করে রেখেছে। রাহুমুক্তি জীবনে ঘটবে কিনা সন্দেহ।

কেন এমন হল? এর জন্য তিনি কতটুকু দায়ী? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিজের দোষ উদ্‌ঘাটন করতে থাকেন শৈলেন্দ্রনাথ। নিজেকে ছেড়ে দেন না। হয়তো তাঁর প্রথম জীবনের অস্নেহ অসহিষ্ণুতাই এই পরিণামের জন্যে দায়ী। ভিন্ন রুচি ভিন্ন আদর্শে গড়া স্ত্রীকে মনে হয়েছে স্থূল দেহ সর্বস্ব বস্তুসর্বস্ব এক স্ত্রীলোক। তাকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ভালবাসেন নি। নিঃশব্দে অবজ্ঞা করেছেন, বড় জোর অনুকম্পা করেছেন। নীরজার শিক্ষা ছিল না, কিন্তু জেদ ছিল, একগুঁয়েমি ছিল। এ সংসারে তাকেই মনে করা হয় ব্যক্তিত্ব। শৈলেন্দ্রনাথ তাঁকে বদলাতে পারেন নি। না পেরে বার বার তাকে আঘাত করেছেন, হাতে নয়, অপ্রীতি অপ্রেম

এবং অসহযোগের ভিতর দিয়ে। সে অসহযোগ সম্পূর্ণ অহিংস ছিল না। তারপর স্নেহ শ্রদ্ধা প্রীতি প্রেমের স্পর্শহীন ঘরে এল সন্তান। তারা শিশু বয়স থেকেই দেখতে শিখল বাপ মায়ের আদর্শগত বিরোধ, আর তার ফলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষে প্রচণ্ড ঝগড়া। কখনো নিঃশব্দে, কখনো অন্তর্ঘাতী বাক্য বিনিময়ের ভিতর দিয়ে। শৈলেন্দ্রনাথের বাবা মা ছেলের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে অল্প বয়স থেকেই নীরজার স্নেহ আর প্রশ্রয়ে ধরা দিল। নীরজা নিজের রুচি আর পছন্দমত ওদের গড়ে তুলতে লাগলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে প্রাচুর্য আর বর্ণাঢ্যতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র, বিলাসিতার নানা উপকরণ-প্রকরণে তিনি ওদের ঘিরে রাখলেন, ঢেকে রাখলেন। নীরজা ওদের শেখাতে লাগলেন, 'যারা সন্ন্যাসী, যারা ফকির, তাদের স্থান ঘরে নয়, গাছতলায়। বিয়ে করে সংসার পাতা তাদের পক্ষে ভুল। তোরা সংসারে সংসারী সাজিস, সন্ন্যাসী সেজে থাকিস নে। পৃথিবীতে কত দেখবার জিনিস, শোনবার জিনিস, ছোঁবার জিনিস, ভোগ করবার জিনিসের ছড়াছড়ি। এখানে কত রঙ কত রূপ কত আনন্দ আহ্লাদ। তোরা সব প্রাণ ভরে ভোগ করিস। তোরা বিদ্বান হবি। কিন্তু সেই বিদ্যা যেন অকেজো না হয়। সেই বিদ্যায় যেন তোদের অর্থ আর যশ দুই-ই বাড়ে। তোরা অনেক টাকা রোজগার করবি, অনেক টাকা খরচ করবি, বাকি যা থাকে তা দিয়ে লোকের দুঃখকষ্ট দূর করবি। যারা গরিব, যারা অক্ষম তারা নিজের কষ্টই দূর করতে পারে না, কি করে পরের কষ্ট ঘোচাবে।'

ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বয়সে নানাভাবে এই একই উপদেশ দিয়েছেন নীরজা। তিনি বলেছেন, 'আমি পেলাম না, জলের কাছে দাঁড়িয়ে আমি তৃষ্ণায় ছটফট করে মরলাম। কিন্তু তোদের যেন সে দুর্গতি না হয়। তোরা যেন পাস, এই ধন দৌলত রূপ যৌবনভরা পৃথিবীর আদর গায়ে মাখতে তোরা যেন লজ্জা পাস নে।'

শৈলেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম বাধা দিয়েছিলেন। শাসনে, উপদেশে, সরল অনাড়ম্বর জীবনের উচ্চ আদর্শ সামনে ধরে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে

রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না। মাধ্যাকর্ষণের মত মানুষের মনের গতিও নিম্নমুখী। জলের মত সে প্রপাত রচনা করে শুধু নীচের দিকে ছোটে। প্রবল ভোগের আকর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি ছেলেমেয়েকে টেনে রাখতে পারলেন না। জয়ন্ত এম. এ. পাস করে ব্যবসায়ীবন্ধুর ওয়ার্কিং পার্টনার হিসাবে যোগ দিল, কিন্তু নিজের পরিবারকে, সমাজকে, দেশকে আর কিছু দিল না। তার রোজগারের বেশীর ভাগ টাকা মদের দেনা শোধ করতে যায়। বীথিকা বি. এ. পর্যন্ত পড়ে পরীক্ষা দিল না, বিয়ে করে স্বামীর ঘর করল না। ছেলেবেলা থেকে গান আর অভিনয়ের দিকে ছিল ঝোঁক। মায়ের উৎসাহে তা বেড়েওছিল। সেই বিদ্যাকে বীথি জীবিকার কাজে লাগিয়েছে। তাতে তার অর্থ আর যশ দুইই বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্নামের বেড়িও জড়িয়ে রয়েছে পায়ে। বীথিকার চালচলন কথাবার্তাই এর জন্যে দায়ী। শৈলেন্দ্রনাথ কতদিন ওকে বলেছেন একটু বুঝে শুনে চলতে। মনে মনে ভেবেছেন, 'বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায় রে অভাগী।' কিন্তু তাঁর মেয়ে কলঙ্কভূষণা হতেই ভালবাসে। জগৎকে তীব্রতম উপহাসে বিদ্ধ করেই তার আনন্দ। কিন্তু শৈলেন্দ্রনাথ জানেন, উপহাস কি পরিহাস কোন শিল্পীরই স্বধর্ম হতে পারে না। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের মধ্যে নেতিবাদ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু শিল্পের পথ অস্তিত্বের পথ, আস্তিক্যের পথ। শিল্পী হবেন বিশ্বাসী। মানুষের মঙ্গলে, মানুষের উত্তরণে তিনি হবেন আস্থাবান। সেই বিশ্বাস তাঁকে সৃষ্টির কাজে প্রেরণা দেবে, সৃষ্টিরক্ষায় সাহায্য করবে। শিল্পী একাধারে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। প্রত্যেক শিল্পীকে মনে আর বাক্যে, চর্যায় আর আচরণে, শিল্পে আর জীবনে এক হওয়ার সাধনা করতে হবে। তিনি জীবন দিয়ে শিল্প গড়বেন, শিল্প দিয়ে জীবন গড়বেন। লোকসমাজে তিনি হবেন আদর্শ। তিনি হবেন কল্যাণ আর সৌন্দর্যের মিলিত মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু বীথিকা এসব কথা শুনে হাসে। বলে, 'বাবা, ওসব তোমাদের মত প্রচারকদের বক্তৃতার ভাষা, ওগুলি জীবনের ভাষ্য নয়। জীবনের যেমন বাঁধাধরা একটি রাস্তা নেই, তার নানা পথ, নানা প্যাটার্ন, শিল্পেরও তেমনি,

শিল্পীরও তেমনি। সব-কিছুকে একটা সাধারণ সুতোয় না বাঁধতে পারলে তোমাদের মন ওঠে না। কিন্তু জীবনও অসাধারণ, শিল্পও অসাধারণ। তার কোনটিই তোমাদের ব্রহ্মসূত্রে বাঁধা পড়ে না। কোথায় দেখেছ জীবন আর শিল্পকে এক হতে? কোথায় দেখেছ একই সঙ্গে শিল্পী আর জীবন-শিল্পীকে? শিল্পীর সে জীবনী, সে জবানী যে অবিশ্বাস্য তার প্রমাণের অভাব নেই। এক নয়, তবে এক হওয়ার একটা তৃষ্ণা আছে এই পর্যন্ত বলতে পার। চিরকালের এই অতৃপ্ত তৃষ্ণাই সৃষ্টির মূল। এই তৃষ্ণা মিটলে শুধু অনাসৃষ্টিই থামবে না সৃষ্টিরও শেষ হবে।'

মেলে না, ওদের সঙ্গে মোটেই মেলে না শৈলেন্দ্রনাথের। মতে, পথে পদ্ধতি-প্রকরণে ওরা সবাই আলাদা। এই অমিলের সংসারে সেবাকে কি তিনি আনবেন? আর এতদিন অমত করে নীরজা আর বীথিকাই বা তাকে আনবার জন্যে এত আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন? ওরা কি তাকেও দলে টানবে? কিন্তু টানলে তিনিও সহজে ছেড়ে দেবেন না। এবার আর তিনি উদাসীন হয়ে অভিমান করে হার মানবেন না। হোক, এবার তাঁর চরম শক্তি-পরীক্ষা হয়ে যাক। তা ছাড়া রেণু আর সেবা যে ভাবে লিখেছে তাতে মেয়েটিকে ওখানে ফেলে রাখাও নিরাপদ নয়। তাতে কর্তব্যের ত্রুটি হবে। ওদের নতুন কোন বিপদ আপদ ঘটতেই বা কতক্ষণ! শৈলেন্দ্রনাথ মন স্থির করে ফেললেন। দেরাজ থেকে একখানা পোস্টকার্ড বের করে দু লাইনে জবাব দিলেন রেণুকণাকে, আর এক লাইন লিখলেন সেবাকে। বেয়ারা ডেকে চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট করতে পাঠিয়ে খানিকটা শান্তি পেলেন শৈলেন্দ্রনাথ।

ফাইলপত্র নিয়ে সহকারী জিতেন সান্যাল সামনে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলেন, লজ্জিত হলেন শৈলেন্দ্রনাথ। আত্ম-চিন্তায় অফিসের আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছেন। স্থির করলেন ছুটির পরেও আজ আর এক ঘণ্টা বেশী কাজ করে যাবেন।

৫

টেলিগ্রাম আর চিঠি একদিন আগে পিছে এসে পৌঁছল। প্রথমে টেলিগ্রামের কথা শুনে তো রেণুকণার হৃদ্‌কম্প। দুঃসংবাদ ছাড়া তো এ সংসারে তারের খবর আসে না। দশ বছর আগে বাবার মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রাম করেই জানিয়েছিলেন রেণুব ছোটকাকা।

কিন্তু সুখময় ইংরেজী কথাগুলির বাংলা অনুবাদ করে বোঝালেন স্ত্রীকে। হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে না না, কোন খারাপ খবর কিছু নয়। তোমার চিঠি পেয়ে বীথি তার করেছে। সেবাকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে।'

রেণুকণা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাই বল। কিন্তু দাদা লিখলেন না, বউদি লিখলেন না, বীথি কেন হঠাৎ তার করতে গেল?'

সুখময় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'অত কথায় তোমার কাজ কি! বীথি নিশ্চয়ই বাপ-মার মত নিয়ে লিখেছে। শুনেছি সেই তো এখন সংসারের কর্ত্রী। তোমার ভাই-ঝি তো আর হেঁজি-পেঁজি নয়। থিয়েটারের নাম করা অ্যাকট্রেস। কাগজে নাম বেরোয়, ছবি বেরোয় মাঝে মাঝে দেখ নি?' একটু যেন খোঁচা ছিল সুখময়ের গলায়।

রেণুকণা অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'না দেখি নি। কত কাগজ-পত্তরই না জানি নিয়ে আস বাড়িতে! আর কত দেখবার সময়ই আমার হয়!'

মুখ গম্ভীর করে কুলোয় করে ডাল বাছতে বাছতে ভাবতে লাগলেন রেণুকণা। তাই তো কোথায় পাঠাচ্ছেন তাঁর সেবাকে! গুণ্ডা-বদমাশরা একবার ওকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। এবার কি তিনি স্বেচ্ছায় বদমাশের হাতে ওকে তুলে দেবেন! যে মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর ঘর না করে থিয়েটারে নেমেছে, কত রকমের কত লোকজনের সঙ্গে যার

মেলামেশা, তার কাছে মেয়ে পাঠানো কি ভাল হবে? কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। রেণুকণা নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনছেন না তো?

টেলিগ্রামটা সেবাও পড়েছিল। একবার নয়, তিন-তিনবার। এতে যেন তার মুক্তির বার্তা লেখা আছে। গ্রামের এই সংকীর্ণতা অশিক্ষা, কুসংস্কার, অর্থহীন গোঁড়ামি থেকে মুক্তি। প্রতিবেশীদের ঈর্ষা-হিংসা-কুটিলতার হাত থেকে মুক্তি। কলকাতা মহানগরীর কথা সে কত বই আর কাগজ-পত্রে পড়েছে। এই গাঁয়ে বসেই কতজনের মুখে শুনেছে। জলপাইগুড়িতে গিয়েও খানিকটা প্রত্যক্ষ করে এসেছে শহরের রূপ। শহর, বিশেষ করে বড় শহর, আধুনিক শ্রীক্ষেত্র। সেখানে নানা জাতের মেলা। নানা জাতের মানুষ মিলে মিশে একসঙ্গে থাকে। এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের খাওয়া-দাওয়া বিয়ে-থা সব হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে সেখানে বাছ-বিচার নেই। কত রকমের কত ঘটনা ঘটে রোজ, কত নতুন নতুন খবর জন্মায়। একজনের বাসি কলঙ্কের খবর নিয়ে সেখানে বেশীদিন কারও মাথাব্যথা থাকতে পারে না। সেই শহরের জনস্রোতে সেবা এবার নিজেকে মিশিয়ে দেবে। সে স্রোত মুক্তিস্রোত। মায়ের চিন্তার কারণ শুনে সেবা বলল, 'তুমি অত ভাবছ কেন মা? ঘরেব মেয়েরা থিয়েটার করলে এখানেই নিন্দা কিন্তু কলকাতায় কোন নিন্দা নেই। জলপাইগুড়িতে থাকতে আমি শুনেছি সব কথা। ওখানকার এক উকিলের মেয়েও নাকি সিনেমায় নেমেছে। কত ভদ্রঘরের বউ-ঝি নাকি আজকাল ওসব কাজ করে।'

রেণুকণা বললেন, 'তা করে করুক। তুমি কিন্তু বাপু ওসবের মধ্যে যেয়ো না।'

সেবা হেসে বলল, 'আমি যেতে চাইলেই বা আমাকে নেবে কেন মা! আমার কি ওসব গুণ আছে?' রেণুকণা বললেন, 'দরকার নেই আমার ওসবে।'

পরদিন এল শৈলেন্দ্রনাথের চিঠি। সে চিঠিতে খানিকটা ভরসা পেলেন

রেণুকণা। হেসে বললেন, 'তাই তো ভাবি। বড়দা কি আমার চিঠির জবাব না দিয়ে পারেন? মায়ের পেটের ভাই নয়। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন আমরা। কিন্তু মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও বাড়া। কত ভালবাসতেন ছেলেবেলায়। স্কুল-কলেজের ছুটি হলেই চলে যেতেন আমাদের দুলালী গ্রামে। ছেলেদের মধ্যে উনি ছিলেন বড়, আর মেয়েদের মধ্যে আমি।'

সেবা জিজ্ঞাসা করল, 'খুব বুঝি ভাব ছিল তোমাদের?'

রেণুকণা বললেন, 'ভাব মানে? মায়ের পেটের বোনকেও লোকে অত ভালবাসে না। ওঁর নিজের তো বোন নেই। ভাইফোঁটা নিতে হলে আমাদের কাছেই আসতে হত। আমরা কয়েক বোনে মিলে ফোঁটায় ফোঁটায় কপাল ঢেকে ফেলতাম। আর দুর্গা পুজোর সময় কি ফুর্তিই না হত! তোরা সে আমোদ আহ্লাদ দেখিসনি সেবা। তাই বললে বিশ্বাস যাবি নে। একসঙ্গে নৌকোয় করে আমরা প্রতিমা দেখতে বেরুতাম। বাবা তো আবার ছিলেন একটু সেকেলে মানুষ। তিনি আপত্তি করে বলতেন, অত বড় ধাড়ী মেয়ে আবার কোথায় যাবে? বড়দা তা শুনতেন না। বলতেন, পিসেমশাই মেয়েরা কি মানুষ নয়? ওদের মনে কি সাধ-আহ্লাদ জাগে না?'

সেবা বলল, 'খুব প্রোগ্রেসিভ ছিলেন তো।'

ইংরেজী কথাটার মানে রেণুকণা না বুঝলেও আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, খুব উদার ছিল ওঁর মন। নিজেরা বন্ধুবান্ধবে মিলে মেয়েদের জন্যে আমাদের গ্রামে একটা স্কুল পর্যন্ত করেছিলেন। সেই প্রথম মেয়ে-স্কুল হল। এত আত্মীয়স্বজন আছে, কিন্তু এমন মানুষ আমি আর দেখি নি। আর সেই মানুষের ভাগ্যে কি দুর্দশাই না হচ্ছে! আমি সব বুঝতে পারি, সব জানি। দূরে থাকলে কি হবে? মন তো আর দূরে নেই। তাঁর চিত্তে সুখ নেই। তা সংসারে যারা ভাল মানুষ হয়ে আসে তাদের কজনেই বা সুখ পায়! সুখ শান্তি হল মানুষের ভাগ্যের কথা।' একটি নিশ্বাস ছাড়েন রেণুকণা।

সেবার যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে। গাঁয়ের পুরোহিত করালী চক্রবর্তীর কাছ থেকে পঞ্জিকা দেখিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে আনেন সুখময়। চক্রবর্তী শুভদিন দেখে দেন, কিন্তু হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বলেন, 'কাজটা কি ভাল হচ্ছে সুখময়? মেয়েটাকে চোখের আড়ালে অমন পগারপার করে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

সুখময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, 'কি করব বলুন? সেবার মার একান্ত ইচ্ছা।'

করালী চক্রবর্তী হেসে বললেন, 'তাই তো বলি হে ভায়া। ওদের ইচ্ছাটা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার চেয়েও বড়। কিন্তু ভাই, যা করবে নিজে বুঝে শুনে কোরো। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—এ হল শাস্ত্রের কথা। যে সংসারে নারী নায়ক আর শিশু নায়ক, সে সংসারের পরিণাম কিন্তু—। যাক, যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তোমার কুল-পুরোহিত, অহিতচিন্তা তো করতে পারি নে। যা মনে এল তাই বললাম।'—অব্রাহ্মণদের হুঁকোয় কলকেটা রেখে সুখময়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে করালী আবার বললেন, 'দেখে শুনে এখানে মেয়ের একটা বিয়ে-থা দিয়ে দিলেই পারতে।'

সুখময় বললেন, 'চেষ্টা তো কম করি নি দাদা, কিন্তু সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। পেছনে শত্রু আছে।'

করালী ভরসা দিয়ে বললেন, 'শত্রু কার না আছে ভাই! শত্রু মিত্র নিয়েই তো জগৎ। পাঠাবার আগে একটু ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখো। কলকাতার মত জায়গা, তাতে আবার সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে। একবার পা পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই। তারপর দুর্ভাগ্যই বল আর যাই বল, অমন একটা দুর্ঘটনা যখন ঘটে গেছে। দেখো ভেবে। 'ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না'—ছেলেবেলায় পড়েছিলাম ভায়া, আজও মেনে চলতে চেষ্টা করি। অমূল্য উপদেশ।'

সুখময় ভাবতে ভাবতে বাড়ি গেলেন। করালী চক্রবর্তীর অবশ্য বুড়ো পাল চৌধুরীর ওপর একটু পক্ষপাত আছে। ছাঁদা আর দক্ষিণাটা সেখানে

ভালই খেলে। মেয়ের বিয়ের সময় কিছু ধারও নিয়েছিলেন। তা শোধ করেন নি। তবু চক্রবর্তীর কথাটা ভেবে দেখবার মত। সত্যিই তো কলকাতার মত জায়গা, তারপর ওইরকম একটা বাড়ি। ওখানে সেবাকে পাঠিয়ে শেষে কি বুক চাপড়াবেন সুখময়, নাকানি-চোবানি খাবেন অকূল সাগরে?

স্ত্রীকে এসে নিজের দ্বিধার কথাটা বলতেই রেণুকণা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'তোমার উঠতে এক মত, বসতে এক মত। আমি মেয়েকে বড়দার কাছে পাঠিয়ে দেবই। তাতে যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে।'

সুখময় বললেন, 'ভারি তো তোমার বড়দা! নিজের মেয়েকে ঠিক রাখতে পারলেন না, আর পরের মেয়েকে রাখবেন। তাঁর ওপরই বা ভরসা কি?'

রেণুকণা বললেন, 'না, তাঁর ওপর ভরসা নেই, ভরসা করব তোমার ওপর। তোমাকেই বা বিশ্বাস কি! অভাব অনটনের সংসার। তার ওপর সেই বুড়োটা টাকার তোড়া নিয়ে তোমার পিছনে লেগেই আছে। কানে ফুসমন্তর দিয়ে চলেছেন পুরুত মশাই। তুমিই যে আজ বাদে কাল লোভে পড়বে না তার ঠিক কি! মানুষের মন না মতি।'

সুখময় চটে উঠে বললেন, 'এত বড় কথাটা বললে তুমি আমাকে? আমি বাপ হয়ে ওই বুড়োটার হাতে—'

রেণুকণা নরম হয়ে নীচু গলায় বললেন, 'কথার কথা বলছিলাম। তুমি যেমন বাবা আমি তেমনি মা। এক-এক সময় লোভ তো আমারও হয়। ভাবি, রাজী হয়ে যাই। মেয়েটাতো খেয়ে-পরে গয়নাগাঁটি নিয়ে সুখে থাকবে। আমিও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাব। দোজবরে মেয়ে কি কেউ দেয় না? আবার ভাবি, বয়সের অত তফাত! তা ছাড়া সে নাকি বিয়ে করে ওকে এখানে রাখবে না। অত সাহস নেই। পাছে লোকে টিটকিরি দেয়। গোপনে গোপনে শহরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। সেখানেই আলাদা বাসা ভাড়া করে রাখবে। তারপর মেয়ের ভাগ্যে যাই থাকুক। ছ্যা-ছ্যা, ও আবার একটা বিয়ে নাকি!'

সুখময় বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি ওসব কথা শুনলে কার কাছে?'

রেণুকণা বললেন, 'কুণ্ডুদের চারুই বলেছে আমাকে। বিধবা হওয়ার পর থেকে চৌধুরীর সঙ্গে তারও তো খুব খাতির। চারুর কাছে সব কথা সে খুলে বলে। চারু আমাকে বলল—খুড়ীমা, অমন কাজও করবেন না। শোন কথা, আমি যেন বরণকুলো সাজিয়ে বসে আছি!'

শেষ পর্যন্ত সেবাকে পাঠানোই স্থির হল। পাল চৌধুরীরা বড়লোক। যুদ্ধের বাজারে অগাধ টাকা করেছে। অনুরোধ না শুনলে যদি জোর জুলুম চালায়, কেড়ে নিয়ে শেষে গুণ্ডাদের নাম দেয়, সুখময়ের কিছু করবার উপায় থাকবে না। কতবার আর মামলা-মোকদ্দমা করবেন মেয়ের জন্যে? তাতেই কি কম কেলেঙ্কারি?

মেয়ের যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন রেণুকণা। ধোপা এত তাড়াতাড়ি কাপড় ধুয়ে দিতে পারবে না। নিজের হাতে সোডা-সাবানে কেচে ক্ষার জলে সিদ্ধ করে ধুয়ে দিলেন সেবার শাড়ি, ব্লাউস, সায়া, বিছানার চাদর। বিছানা বালিশ বেঁধে দিলেন এক প্রস্থ। নিজের মাথার বালিশটি দিলেন সঙ্গে। সেবা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও নিজের অনেক দিনের পুরনো শান্তিপুরী শাড়িখানা সেবার ট্রাঙ্কে এনে রেখে দিলেন। নিজের গলার অবশিষ্ট হারছড়াও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেবা কিছুতেই নিল না। বলল, 'তার চেয়ে তুমি চলে যাও। আমি থাকি। তোমার ওই পুরনো প্যাটার্নের গয়না পরে আমি কিছুতেই বেরোতে পারব না।'

রেণুকণা বললেন, 'বেশ তো প্যাটার্নটা বদলে নিবি। স্যাকরার দোকানে দিলেই বদলে দেবে।' সেবা বলল, 'কি যে বল মা! তোমার ব্যবহার করা জিনিস, তোমার বাবার হাতের চিহ্ন আমি ভাঙব?'

রেণুকণা বললেন, 'তোর গলা যে খালি থাকবে!'

সেবা বলল, 'তা থাকুক।'

রেণুকণা মনে মনে দুঃখ করলেন, তাঁর এমন সুন্দরী মেয়েকেও মনের সাধ মিটিয়ে শাড়ি-গয়নায় সাজাতে পারলেন না। লোকে কত কালো কুচ্ছিত কানা খোঁড়া মেয়েকে সাজায়। আর তাঁর এমনই ভাগ্য যে, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

গলা খালি রইলেও সেবার ডান দিকের বাহুটি খালি রইল না।

সেবার ঠাকুরমা তরুবালা এগিয়ে এসে বললেন, 'তোর যাওয়াই ঠিক হল নাকি, ও সেবা?'

সেবা বলল, 'হ্যাঁ, ঠাকুরমা।'

সেদিনের ঝগড়ার পর সেবা আর তাঁর সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলে নি। দূরে দূরেই ছিল।

যাওয়ার আগের দিন মান অভিমান ত্যাগ করে তরুবালাই এলেন নাতনীর কাছে। অভিযোগের স্বরে বললেন, 'আমার কাছে কেউ তো কিছু বলে না, জিজ্ঞাসাও করে না। আমি আজ পরস্য পর হয়ে গেছি। তা যাচ্ছিস, বেশ। মামার বাড়ি থেকে কিছুদিন ঘুরে আয়, বেড়িয়ে আয়। মনটা ভাল থাকবে। আর এই কবচটা নে, যত্ন করে হাতে ভক্তি করে বেঁধে রাখ্।'

সেবা বলল, 'ও কবচ আবার কিসের ঠাকুরমা?'

তরুবালা বললেন, 'রক্ষাচণ্ডীর কবচ। চণ্ডীতলা থেকে করিয়ে আনলাম।' সেবা বলল, 'ও সব কবচ-টবচ আমি আর পরব না ঠাকুরমা।' তরুবালা রাগ করে উঠলেন, 'ছি ছি ছি, তুই না হিন্দুর ঘরের মেয়ে! ও কথা বলে নাকি?' তারপর একটু আদর করে বললেন, 'পর লক্ষ্মী দিদি আমার, পর কবচটা। তোর ভালর জন্যই বলছি। সারাদিন উপোস করে থেকে ওই কবচ আমি করিয়েছি। রক্ষাচণ্ডীর কবচ যে ভক্তিভরে ধারণ করে তার কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারে না।' সেবা বলল, 'কিন্তু ঠাকুরমা, ওই রকম একটা কবচ তো সেবারও আমার হাতে ছিল, কই, রক্ষা তো পেলাম না!' তরুবালা বললেন, 'রক্ষা পেলি নে কি রে, প্রাণে বেঁচেছিস, ফিরে আসতে পেরেছিস, এ কি আমার কম ভাগ্য! মা চণ্ডী ঠাকরুণ মুখ তুলে না চাইলে এ কি হতে পারত?' রেণুকণা ঘরের ভিতর থেকে বললেন, 'আঃ, কেন তর্ক করছিস সেবা, বুড়ো মানুষ দিচ্ছেন, ভক্তি করে পর্।'

সেবা এবার হাত পেতে কবচটি নিল। তারপর একটু দূর থেকে মাটিতে

মাথা রেখে ঠাকুরমার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। তরুবালা এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখে বিড় বিড় করে'কি যেন আশীর্বাদ করলেন।

সেবা বলে উঠল, 'ও কি ঠাকুরমা, তুমি আমাকে ছুঁয়ে ফেললে যে! এই অবেলায় তোমাকে যে আবার নাইতে হবে।'

তরুবালা এ কথার আর কোন জবাব না দিয়ে কাপড়ের আঁচলে চোখ দুটি মুছে নিলেন।

দুপুরের দিকে ট্রেন। সকাল থেকেই উদ্যোগ আয়োজন শুরু হল। রেণুকণা তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না শেষ করলেন। এরই মধ্যে পাঁচ রকমের ডাল আর মাছ তরকারি রেঁধেছেন। মিষ্টান্ন করেছেন। শুভচিহ্ন হিসেবে পাথরের বাটিতে করে দইও পেতে রেখেছেন ঘরেই। সতী আর সুদেব আজ আর স্কুলে যায় নি। তারা মুখ ভার করে দিদির পিছনে পিছনে ঘুরছে। সুদেব ছল-ছল চোখে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সত্যি, চলে যাবে দিদি?

সেবার আজ আর যেতে ইচ্ছা করছে না। কিসের মুক্তি? এখান থেকে সে মুক্তি চায় না। এই চণ্ডীপুরের বাড়ি-ঘর বাপ-মা ঠাকুরমা ভাই বোন কুকুর-বিড়াল গরু-বাছুর গাছপালা সবাই যেন তাকে আজ দু-হাতে টেনে রাখতে চাইছে। প্রত্যেকের জন্যে প্রাণ কাঁদছে সেবার। মন কেমন করছে পাড়াপড়শী, বিশেষ করে সমবয়সী বাল্যসঙ্গিনীদের জন্যে। তাদের অনেকেই আজ বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে। তবু দু-তিনজন যারা আছে তাঁরা এসে দেখাসাক্ষাৎ করে গেল। বার বার করে বলল, 'চিঠি দিস ভাই. 'চিঠি দিস কিন্তু।'

সেবা ঘাড় কাত করে বলল, 'দেব।' ছোট ভাই বোন দুটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি শিগগিরই ফিরে আসব, বুঝেছিস সতী সুদেব? কত কি আনব তোদের জন্যে। আর সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লিখব তোদের কাছে। চিঠির জবাব দিবি তো?'

'সত্যি, কেন এমন করছে মনটা? নিজের মনের ভাব-গতিক দেখে সেবা নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। সে তো আর চিরতরে বিদায় নিচ্ছে না, এদের কাছ থেকে পর হয়ে স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে না। নেহাতই মামার বাড়িতে

যাচ্ছে দিন কয়েকের জন্যে। তবু কেন এমন করছে মন! যাঁদের চেনে না শোনে না, জীবনে কোনদিন দেখে নি, তাঁদের কাছে যেতে এবার সেবার মনেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। না জানি তাঁরা কি ভাবে তাকে নেবেন, সেবার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবেন তাঁরা! গলগ্রহ ভাববেন কিনা কে জানে! আশ্রিত-আশ্রিতাকে তাই তো ভাবে লোকে। তাঁরা তো আদর করে তাকে ডেকে নেন নি, সেবা নিজেই যেচে যাচ্ছে সোহাগ কুড়োতে। ছিঁটেফোঁটাও না যদি মেলে তা হলে কি মুখ থাকবে।

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই, দ্বিমনা হবার অবসর নেই আর। গরুর গাড়ি প্রস্তুত। সেবাদের বাড়ির সুমুখ দিয়ে যে মেটে কাঁচা রাস্তাটি জেলা-বোর্ডের বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে সেই রাস্তার মোড়ে কালু বাগদী এনে রেখেছে তার গাড়িখানা। সুখময় বড ব্যস্তবাগীশ মানুষ। তাড়া দিয়ে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে নিয়ে এসেছেন বেচারীকে। সেবা বলেছিল, 'গাড়ির দরকার নেই বাবা। কতটুকু বা পথ! আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারব। এব আগে কতবার তো গিয়েছি। বাক্স বিছানা নেওয়ার জন্যে একজন মুটে ডাকলেই হবে।'

কিন্তু ব্যবস্থাটা সুখময় পছন্দ কবেন নি। গাডিই নিয়ে এসেছেন। তিনি অবশ্য যাবেন মেয়ের সঙ্গে। তিন দিনেব ছুটি নিয়েছেন দোকানের মালিকের কাছ থেকে।

গাড়িতে উঠে বসবার আগে সেবা ঠাকুরমা বাবা মা সবাইকে প্রণাম করল। দূর থেকে প্রণাম করে এল ঠাকুবঘরে। ঠাকুরদেবতার ওপর অত বিশ্বাস আর নেই সেবাব। কিন্তু প্রণাম না কবলে মা আব ঠাকুরমাই শোরগোল তুলবেন।

মেয়েদের যাত্রামন্ত্র লাগে না। তবু পঞ্জিকা খুলে সুখময় আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তাঃ বৃষগজতুরগাঃ দক্ষিণাবর্ত্ত বহ্নি—'

এই ফাঁকে সেবাকে আড়ালে ডেকে নিলেন রেণুকণা। বুকের কাছে টেনে নিলেন। মায়ের মাথা ছাড়িয়ে গেছে মেয়ে। রেণুকণা বললেন, 'আমার কথাগুলো সব মনে রেখেছিস তো সেবা?'

'হ্যাঁ মা, কতবার তো বলেছ। মুখস্থ হয়ে গেছে।'

রেণুকণা একটু হেসে বললেন, 'ফাজিল কোথাকার! খুব সাবধানে খুব বুঝে শুনে চলবি। কারও কোন ফাঁদে পা দিবি নে।'

'আচ্ছা।'

'আর সপ্তাহে একখানা করে পোস্টকার্ড লিখবি আমার কাছে। নইলে এখান থেকে তার যাবে তা মনে রাখিস কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

রেণুকণা এবার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আর একটা কথা।'

'বল।'—মার চোখের দিকে তাকাল সেবা।

রেণুকণা বললেন, 'ইয়ে—ওই ব্যাপারটার কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাকে বলবি, তুই গুণ্ডাদের বাড়িতে তিন দিন ধরে শুধু জল আর কাঁচা দুধ খেয়েছিলি। আর তোকে তারা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। সেই বাড়ির দু-তিন জন গিন্নী তোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

সেবা বলল, 'কিন্তু মা এসব কথা তো সত্যি নয়। খিদের জ্বালায় না থাকতে পেরে আমি সবই খেয়েছিলাম। আর প্রাণের ভয়ে আমি সবই—। সব কথাই তো মামলার সময় কাগজে বেরিয়ে গেছে। এখন মিথ্যে কথা বলতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাব।'

রেণুকণা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর মত বোকা মেয়ে আর বিশ্ব-দুনিয়ায় নেই। কাগজে যা বেরিয়েছিল তা কি সবাই পড়েছে, না সকলে মনে করে রেখেছে? তা ছাড়া বেশী কিছু বেরোয়ও নি। যাতে না বেরোয় তার ব্যবস্থা ওঁরা করে রেখেছিলেন। এসব সত্ত্বেও তুই যদি ইচ্ছে করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারিস সেবা, সে কুড়ুল আমার মাথায় পড়বে।'

সেবা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাই করব।'

রেণুকণা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করিস। আমি যা বলি তা তোর ভালর জন্যেই। সব ব্যাপারে বেশী বেশী সরলতা ভাল নয়। যে যেমন মানুষ তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করবি। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলবি মিশবি, তাঁদের ভালবাসবি।' সেবা বলল, 'তোমার কথা মনে রাখব মা।'

এর পর সেবা বাবার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে লাগল আস্তে আস্তে। সুদেব আর সতী পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত এল। বাপের ধমকে পরম অনিচ্ছায় ফিরে গেল তারা। কিন্তু তরুবালা অত তাড়াতাড়ি ফিরলেন না। তিনি গাড়ির পিছনে অনেক দূরের ব্যবধানে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সেবা ডেকে বলল, 'তুমি রোদের মধ্যে অত কষ্ট করে কেন আসছ ঠাকুরমা? তুমি যাও।' কিন্তু তরুবালা তা শুনতে পেলেন না। এর পর সুখময় উঠলেন ধমক দিয়ে, 'বাড়ি যাও বলছি। পড়ে-টড়ে গিয়ে তুমি একটা কাণ্ড বাধাবে।' কিন্তু অত দূর থেকে ছেলের ধমকও বোধ হয় শুনতে পেলেন না। তিনি এগোতেই লাগলেন। সুখময় গাড়োয়ানকে বললেন, 'গাড়িটা জোরে চালাও তো কালু। চোখের আড়ালে যেতে না পারলে মাকে আর ফেরানো যাবে না।'

একটু বাদেই অবশ্য পথের বাঁকে একটা আমবাগানের আড়ালে পড়ে গেলেন তরুবালা। তাঁকে আর দেখা গেল না। কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেবার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল। আর সেই ঝাপসা চোখে সে দেখতে লাগল, ঠাকুরমা যেন এখনও এগিয়ে আসছেন, আরও এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে।

৬

'তারপর তোমাদের থিয়েটারে নতুন ব
পান্থশালার তো তিন শো না সাড়ে তিন শো

বীথিকাদের ড্রয়িংরুমে কোণের দিকে
দিয়ে হলদে রঙের গোল্ডফ্লেকের কৌটো খে.
সিগারেট তুলে নিয়ে সেটিকে দুই ঠোঁটের মাঝ.
রায়। অগ্নিসংযোগের কোন গরজ দেখাল না। বীথির
একটু হেসে বলল, 'কি খবর তোমাদের থিয়েটারের?'

বত্রিশ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক শুভেন্দু। মাথার ঘ
কালো চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। প্রশস্ত কপাল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি উজ্জ্বল
চোখে আর ঠোঁটের কোণে জগৎ-সংসারের সব-কিছু সম্বন্ধে যেন কয়েক
ফোঁটা ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে। পরনে মিহি আদ্দির
পাঞ্জাবি, সোনার বোতামে আটকানো। বুকপকেটের দামী ফাউন্টেন
পেনটি কালো টর্পেডো আকৃতির উচ্চ শির উদ্ধত করে রেখেছে। যেন
মালিকেরই একটি প্রতীক সংস্করণ। কালো ইঞ্চি-পেড়ে কাঁচি ধুতির কোঁচা
গ্লেজকিডের ঝকঝকে পালিশ-করা জুতোর ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু
একেবারে সবটুকু ঢেকে ফেলে নি।

উল্টো দিকের সোফায় বসে ছিল বীথিকা আর তার দাদা জয়ন্ত। বীথিকা
সান্ধ্যভ্রমণের জন্য তৈরী। সবুজ কলাপাতা-রঙের শাড়িতে তাকে আরও
কমবয়সী মনে হচ্ছে। পাউডার সুর্মা আর ওষ্ঠ-রঞ্জনীতে মুখখানা সযত্ন-
প্রসাধিত। আঙুলের প্রতিটি নখের স্বাভাবিক সাদা রঙের ওপর খয়েরী
প্রলেপ বুলিয়েছে বীথি। কানে দুটি লাল পাথরের ফুল জ্বলজ্বল করছে।
আঙুলের হীরের আংটির ওপর পশ্চিমের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের
আলো এসে পড়েছে।

.য় বসে সকালের ইংরেজী কাগজটা মন দিয়ে
ব সঙ্গে বেরুবে না। আটপৌরে তার বেশ।
হাফশার্ট, পরনে ঢিলে পাজামা। মুখে
র গড়ন অনেকটা বাপের মত হলেও শৈলেন-
লিত ভাব নেই জয়ন্তের মুখে। চোখে কেমন
ব দৃষ্টি। কাগজ থেকে সে যখন মাঝে মাঝে
ভঙ্গি ফুটে বেরুচ্ছে তার মুখ থেকে। শুভেন্দু
.াড়।

.ইটারে সিগারেটটি ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি
..র জবাব দিচ্ছ না যে?'

.টি ঠোঁটের ফাঁকে শুভ্র সুন্দর দাঁতের সারি দেখা গেল বীথিকার।
.স বলল, 'জবাব আর কি দেব বল? ভাবছি রঙ্গজগতের খোঁজখবর
ত কম রাখ তুমি। তিন শো সাড়ে তিন শো কি বলছ? আমাদের
পান্থশালা চার শো রজনী অতিক্রম করেছে। অন্তত হাজার রাতের আগে
আমরা থামব না।'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'তাই নাকি? সহস্রাধিক এক আরব্য রজনী।
থিয়েটারের মালিককে একেবারে লাল করে দিলে দেখছি।'

বীথিকা বলল, 'দিলে কি হবে! তোমার মনে তো একটুও রঙ ধরাতে
পারলাম না। তুমি বোধহয় পুরো নাটকটা একদিনও দেখ নি। এত পপুলার
হয়েছে। শুধু তোমারই ভাল লাগল না।'

শুভেন্দু কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, 'ভাল লাগল না বলছ কি!
আমি অন্তত ছ-সাত দিন বসে বসে পুরো নাটকটা শেষ করেছি। তবে
একটানা শেষ যবনিকাপাত পর্যন্ত অবশ্য ঠিক কোন রাতেই থাকতে পারি
নি। অত হজমশক্তি আমার নেই। এমন কি তোমার মত হজমিগুলি
থাকা সত্ত্বেও—'

হঠাৎ কাগজখানা হাতে করে জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দে.
কোন ব্যবস্থা হল নাকি!'

শুভেন্দু বলল, 'সরি, জয়ন্ত। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি কাগজের আড়ালে আছ। তোমার আর তোমার ছোট বোনের মধ্যে ওই নলচের আড়ালটুকুই যথেষ্ট। পর্দার কি দেয়ালের আডাল যথেষ্টের চেয়ে অনেক বেশী।'

জয়ন্ত কোনও জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বীথিকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুভেন্দুকে বলল, 'সত্যি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান হল না। দাদার সামনে তুমি আমাকে বেশী ঠাট্টা তামাসা কর, ও তা পছন্দ করে না—তুমি তো জানই।'

শুভেন্দু বলল, 'আব আমি যে তা দারুণ পছন্দ করি তাও জয়ন্ত না জানে তা নয়। যাই বল পৈতৃক ধরন-ধারন আর শুচিবাই কিছু ওর রয়েই গেল। এত সুর-স্রোতেও সব ও ভাসিয়ে দিতে পারল না।'

বীথিকা বলল, 'ভাসিয়ে দেওয়া সহজ নয়। ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক কি না তা নিয়েও তর্ক আছে। সে যাক গে। সাহেবী ধড়াচূড়ার বদলে তুমি যে একেবারে আজ নটবব সেজে এসেছ।'

শুভেন্দু বলল, 'তুমি যেখানে নটীশ্রেষ্ঠা, আমাকে সেখানে নটবর না হলে কি মানায়? যাই বল তোমাব মুখোশটিও আজ বড়ই চমৎকার হয়েছে। 'পেণ্টেড ভেলে'র মত 'পেণ্টেড মাস্ক্'।'

বীথিকা তাতে বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে জবাব দিল, 'আমি একটু হেভি মেক-আপের পক্ষপাতী তা তো জানই। মুখোশ আমিও পরি, তুমিও পর। তবে তোমার সুবিধে এই, তার জন্যে তোমার আলাদা করে মেক-আপের দরকার হয় না। তোমার মুখের সঙ্গে মুখোশটা এমনভাবে এঁটে গেছে যে তা আর খুলতে হয় না তোমাকে। তোমার সে ক্ষমতাও আর নেই।'

কেউ কারও কাছে সহজে হারে না। বাক্‌যুদ্ধ তো নয়, যেন ধারালো তলোয়ারের খেলা। মাঝে মাঝে সেই তলোয়ারের খোঁচা পরস্পরের মর্মে গিয়ে বেঁধে। ভিতরে ভিতরে রক্তপাত হয়। কিন্তু কেউ সে কথা সহজে আ[illegible] করে না। ওরা পরস্পরের দোষ-ত্রুটি দৌর্বল্য সবই জানে। কোন গোপনতা নেই, কোন রহস্য নেই, নতুন করে রহস্যসৃষ্টির কোন চেষ্টাও নেই।

ওরা পরস্পরকে বড় বেশী জেনে ফেলেছে, বেশী চিনে ফেলেছে। সেই অতি-পরিচয় ওদের কাছে ব্যঙ্গ আর কৌতুকের উপাদান।

তবু ওদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বও আছে। শিল্প সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি জীবনযাপনের ধরন-ধারন সম্বন্ধে ওদের মধ্যে যে বিশেষ মতভেদ আছে তা নয়। মুখে যত তর্কই করুক, মোটামুটিভাবে ঐক্যটাই বেশী। দুজনেই সংশয়ী। কোন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নেই। সব-কিছুকেই বাজিয়ে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা ওদের। দুজনেই বুদ্ধিমার্গী। অন্তত নিজেরা তাই বলে। ওদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে যে, ওরা সম্পূর্ণভাবে কেউ কাউকে চাইবে না। ওরা পরস্পরের কাছে একনিষ্ঠার দাবি করবে না। কারণ সে দাবি ভুল। সে দাবি অযৌক্তিক। ওদের বিশ্বাস, একজন আব একজনকে অখণ্ডভাবে চিবদিনের জন্যে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তা যখন পারে খানিকটা প্রতারণা করে, শুধু অন্যের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেও। আসলে অখণ্ডতা বলে আলাদা কিছু নেই। প্রত্যেকটি অংশই পূর্ণ। প্রতিটি মিলন-মুহূর্তই পূর্ণ। জীবন এই কতকগুলি ক্ষণের সমষ্টি। তার মধ্যে কোন-কোনটি মাহেন্দ্রক্ষণ এইমাত্র।

ওরা মোটামুটি এই নীতি মানে—একজনের সব ভার চিরদিনের জন্যে কেউ বহন করতে পারে না। যদি জোর করে সেই ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় তা দুঃসহ আর দুর্বহ হতে বাধ্য। তাই সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্যে একনিষ্ঠতা অপরিহার্য নয়। দীর্ঘদিনের সংস্কাবে আচ্ছন্ন বলেই মানুষ তা অপরিহার্য বলে মনে করে।

থিয়োরি হিসেবে দুজনেই ওরা এ কথা স্বীকার করলেও গোলমাল বাধে জীবনে সেই থিয়োরির প্রয়োগ নিয়ে। শুভেন্দু যখন বীথিকাকে ছেড়ে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, বীথিকা তা সহ্য করতে পারে না। তার মন শুভেন্দুর প্রতি আপনিই বিরূপ হয়। কখনও বিতৃষ্ণায় বরফ হয়ে যায়, কখনও অতিতৃষ্ণায় আগুনের মত জ্বলে। শুভেন্দুকে ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তুমি মেয়েদের দেহ ছাড়া আর কিছু চেন না।'

আবার বীথিকা যখন অন্য কোন ধনবান কি প্রতিষ্ঠাবান পুরুষের

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যায়, শুভেন্দু খোঁটা দিয়ে বলে, 'তুমি চেন শুধু টাকার থলি।'

কিছুদিনের জন্যে ঝগড়া হয়, আবার তারা কাছাকাছি আসে। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে থাকলেও এদিক থেকে তাদের চাল-চলনটা প্রায় দম্পতির মতই।

শুভেন্দুর সঙ্গে বীথিকার পরিচয় কম দিনের নয়। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে প্রায় বছর তিনেক ধরে ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। অবশ্য দাদার বন্ধু হিসেবে পরিচয় তারও আগে থেকে। এখন সে শুধু জয়ন্তের বন্ধু নয়। ব্যবসায়ের অংশীদার, সহকর্মী। ব্রাবোর্ন কোর্টে কাগজের কারবার আছে দুই বন্ধুর। মূলধন বেশীর ভাগই শুভেন্দুর। কিন্তু পরিচালনা আর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জয়ন্তই অনেকখানি বহন করে। এককালে দুজনে সহপাঠী ছিল, এখন ব্যবসায়ের শরিক। সেই সূত্রেই শৈলেনবাবুর পরিবারে শুভেন্দুর প্রথম থেকে যাওয়া-আসা। তারপর জয়ন্তের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেয়ে তার ছোট বোনের সৌখ্যই শুভেন্দুর কাছে বেশী আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। শৈলেনবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করেন মেয়েকে ফেরাবার, স্নেহে শাসনে তাকে শুভেন্দুর প্রভাব থেকে মুক্ত করবার তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নি। কিন্তু বীথিকা তখন সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পুরোপুরি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শক্তিও যেন তার আর নেই।

তবু বীথিকার মা নীরজা এখনও আশা রাখেন, ওরা হয়তো একদিন বিবাহ-বন্ধন মেনে নেবে। ওদের মন-বোঝাবুঝির পালা হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হবে। তারপর ছেলেপুলে হয়ে গেলে, ঘর-সংসারে মন বসলে যে অস্থিরতা ওদের মধ্যে এখনও আছে তা আর থাকবে না।

বীথিকার সঙ্গে শুভেন্দুর বিয়েতে আইনঘটিত আর কোন বাধাই নেই। এখন ওদের নিজেদের অন্তরের বাধাটুকু দূর হলেই হয়। তার জন্যে নীরজা কম চেষ্টা করছেন না। শুভেন্দুকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন। আদর-আপ্যায়নে তাকে আরও অন্তরঙ্গ করে তোলবার চেষ্টা করছেন। তবু বিয়ের কথায় শুভেন্দু কান পাতছে না। বীথিকাও তাতে আপত্তি করে।

সে বলে, 'একবার তো পরীক্ষা করে দেখা গেল মা, আর কেন? জীবনের একই প্যাটার্ন সকলের জন্যে নয়। দাম্পত্য-বন্ধন যে কি বস্তু, তা তোমাকে আর বাবাকে দেখে শিখেছি, আবার নিজের বেলায় ঠেকেও শিখলাম। এই বেশ আছি। তোমার আশীর্বাদে আর্টকে আমি ভালবাসতে পেরেছি। সে আমার সব ক্ষুধা মেটাবে। তার মধ্যে আমি সব পাব।'

নীরজার যেন এতটা বিশ্বাস হতে চায় না। তিনি বলেন, 'তাই কি আর হয়? এক জিনিস কি মানুষের সব সাধ মেটাতে পারে? তা ছাড়া বুড়োবয়সে কি করবি?'

বীথিকা বলে, 'বুড়োবয়সের কথা বুড়োবয়সে ভাবব। আগে থেকে ভেবে ভেবে বুড়ো হয়ে লাভ কি!'

শুভেন্দুও সেই কথা বলে! তারও ধারণা, এক বয়সের ভাবনা আর এক বয়সে ভেবে রাখা যায় না। জীবনের এক এক পর্যায় এক এক রকমের অভাবিত সমস্যা নিয়ে আসে, আগে থেকে কি করে তার সমাধান সম্ভব!

মুখোশ নিয়ে তর্ক করবার পর দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তাবপর একটু বাদেই শুভেন্দু হেসে বলল, 'খুব একচোট ঝগড়া হল, এবার এস, সন্ধি করে ফেলি। তোমার দাদা যে চায়ের সন্ধানে গেল সে তো আর ফিরল না।'

বীথিকা বলল, 'সে কি আর সত্যিই চায়ের সন্ধানে গেছে! পাছে তার প্রেজেন্সে তুমি আরও কিছু বেফাঁস কথা বলে বস তাই সরে পড়েছে।'

শুভেন্দু বলল, 'এও এক ধরনের এস্কেপিজ্‌ম্‌। ওর উচিত ছিল, হয় আমাদের সামনে বসে আরও বেফাঁস কথা বলা, নয় ধমক দিয়ে আমাদের মুখবন্ধ করে দেওয়া। মিলিট্যাণ্ট রিফরমাররা তো তাই করে।'

বীথিকা বলল, 'সবাই তো আর সমান নয়। দাদা বোধ হয় বাবাকে দেখে ঠেকে শিখেছে। ধমক দিলেই পাপীতাপীদের মুখ বন্ধ করা যায় না। হাতেব তালুতে মুখ চেপে রাখলে পাপ আরও অন্তর্মুখি হয়।'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'পাপ, পাপী এসব কথা কি বলছ? তুমিও কি শেষ পর্যন্ত মরালিস্ট হয়ে উঠলে?'

বীথিকা বলল, 'তোমার সে ভয় নেই। কস্মিনকালেও আমি নীতিবাগীশ হব না। কিন্তু ডিকশনারি তো তাদের হাতেরই তৈরী, তাই পরিভাষাগুলি বলার সুবিধের জন্যে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে কি জান? নতুন করে অভিধান লিখি। মরালিস্টরা যাকে পাপ বলে তার নাম দিই পুণ্য, ওরা যাকে মিথ্যা বলে তার নাম দিই সত্য, যাকে অকল্যাণ আব অমঙ্গল বলে তার নাম রাখি শুভেন্দু।' মুখ টিপে হাসতে লাগল বীথিকা।

শুভেন্দু বলল, 'বটে! আমি বুঝি তোমাব কাছে অকল্যাণ আর অমঙ্গলের আধারই হয়ে উঠেছি?'

বীথিকা বলল, 'আহা, চটছ কেন? সে তো ওদেব স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট থেকে, ওদের পরিভাষায়। কিন্তু ওদের ভাষা তো আব আমাদেব ভাষা নয়।'

শুভেন্দু বলল, 'চুলোয় যাক ভাষা। চল, এবার আমরা উঠে পড়ি বীথি। চা তোমাদের এখানে আজ আর পাবাব আশা নেই। চল, বাইরে গিয়েই খাওয়া যাবে।'

বীথিকা বলল, 'আর পাঁচ মিনিট বোস। ঘর থেকে খেয়ে গেলেই যে বাইরে খাওয়া যাবে না তাব কি মানে আছে! আমবা গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব। আমার এক মেসোমশাই হঠাৎ আমেবিকা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি কাশ্মীবেব চন্দনকাঠের বাক্স, কাশীর জর্দা আর দার্জিলিংয়ের সেবা সুগন্ধি আর সুস্বাদু চা নিয়ে এসেছেন মার জন্যে। শালীভগ্নীপতিতে মিলে সেই চা এতক্ষণ ধবে তৈরী হচ্ছে, তা যদি তুমি না খেয়ে যাও শুভেন্দু, মা বড় কষ্ট পাবেন।'

শুভেন্দু কোন কথা না বলে আব একটি সিগারেট ধরাল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাব নীল পর্দা সরিয়ে ভিতর থেকে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন নীরজা। তাঁর পিছনে পিছনে আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁরও বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে। বেশ লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ চেহারা। মাথার ঘন কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে দুটি একটি রুপালী রেখা দেখা যাচ্ছে। গায়ের রঙ কালো। মুখখানা খুব যে সুশ্রী তা নয়, তবে বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব আর আত্মপ্রত্যয়ের

ছাপ আছে। চোখ দুটি চঞ্চল। পরনে শার্ট আর ট্রাউজার। তিনি ঘরে ঢুকেই বীথির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে বীথি, ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছ।'

নীরজা বললেন, 'বেরিয়ে ঠিকই পড়ত। আমিই জোর করে আটকে রেখেছি। বলেছি, চা না খেয়ে যেতে পারবি নে।' এর পর তিনিই শুভেন্দুর সঙ্গে নবাগত ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন: 'আমার ভগ্নীপতি যোগেশ্বর দত্ত। এতদিন ভবঘুরে ছিলেন, এবার কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করবেন বলে এসেছেন। কিন্তু পছন্দমত বাড়ি পাচ্ছেন না। আর এর কথাই আপনাকে একটু আগে বলছিলাম জামাইবাবু। শুভেন্দু রায়, জয়ন্তর পার্টনার। কিন্তু ওটা ওর বাইরের পরিচয়। আসলে শুভেন্দু এ বাড়ির ছেলের মত। খুবই ভাল ছেলে।'

শুভেন্দু নমস্কার করতে যোগেশ্বরবাবু হাত তুলে প্রতিনমস্কার করলেন। হেসে বললেন, 'তোমার যখন সার্টিফিকেট পাচ্ছে, ভাল ছেলে তো বটেই। আজকালকার দিনে মহিলাদের প্রশংসা পাওয়া সহজসাধ্য নয়।'

যোগেশ্বরের এই মন্তব্যের কেউ কোন জবাব দিল না। কিন্তু তাতে তিনি যে অপ্রতিভ হলেন তা নয়। বসে বসে শুভেন্দুকে আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

একটু বাদে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে রুক্মিণী ঘরে ঢুকল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত। হাতের খবরের কাগজটা সে অন্য ঘরে ফেলে এসেছে। কিন্তু বেশবাস ঠিক আগের মতই আছে। তা দেখে নীরজা বললেন, 'ও কি জয়ন্ত, কি একটা ময়লা পাজামা পরে রয়েছ! এঁরা সব আছেন এখানে। যাও, বদলে এস কাপড়টা।'

জয়ন্ত একটু হেসে বলল, 'মা, এখানে তো বাইরের কেউ নেই। সবাই আত্মীয় বন্ধু আপন জন। এদের কাছে তোমার অত লজ্জা কিসের?'

নীরজা বললেন, 'তুমি বাইরের লোকের কাছেই কি শুধু আমাকে অপ্রস্তুত কর! এমন একটা উদাসীর বেশে থাক যে দেখতে আমার বড় বিশ্রী লাগে।'

যোগেশ্বরবাবু বললেন, 'নীরজা, তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। শেষে কিন্তু বলতে পারবে না—জামাইবাবু, আপনার চা খারাপ, আপনি মিথ্যে বড়াই করেছিলেন। চা খেতে খেতে ছেলেকে শাসন কর। রথও দেখ, কলাও বিক্রি কর।'

নীরজা বললেন, 'আপনি হাসছেন জামাইবাবু, কিন্তু আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম। এ সব ব্যাপারে ঠিক একেবারে পিতৃধারা পেয়েছে।'

যোগেশ্বরবাবু হেসে বললেন, 'তা তো কিছু পাওয়াই উচিত। ছেলে মেয়ে ষোল আনা তোমার মত হবে তা কি করে আশা কর? আধা-আধিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কি বড়জোর দশ আনি ছ আনি। ভাল কথা, শৈলেনবাবু যে এখনও এলেন না! আজ তো শনিবার। আজ তো একটু সকাল সকাল তাঁর ফেরার কথা।'.

বীথিকা মৃদু হেসে বলল, 'বাবার ফেরবার কিছু ঠিক নেই মেসোমশাই। তিনি হয়তো এতক্ষণ কলেজ স্ট্রীটে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে পুরনো বই ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন—যদি কোন লুপ্তরত্ন উদ্ধার হয়! বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে হয়তো আপনার রাত দশটা বেজে যাবে।'

বীথির কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে ব্যস্ত ভারি গলার শব্দ এল: 'এই ড্রাইভার, রোকো রোকো। আরে, এই তো ছত্রিশের ডি। হ্যাঁ মশাই, শৈলেনবাবু এ বাড়িতে থাকেন?'

মায়ের উপদেশ-বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে জয়ন্ত ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সুখময় তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

জয়ন্ত নীচের দিকে ঝুঁকে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বাড়ি। আসুন আসুন, সদর-দরজা দিয়ে চলে আসুন।' তারপর ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মা, পিসেমশাই বোধহয় এসে গেলেন।'

এ কথা শুনে যোগেশ্বরবাবু বীথির দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, 'মতলব কি তোমাদের? মেসোমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পিসেমশাইকে এনে হাজির করলে? মেষ আর মোষের লড়াই দেখবার ইচ্ছে আছে বুঝি?'

এ কথা শুনে বীথি হেসে উঠল। শুভেন্দুও মুখ মুচকে হাসল। নীরজা বললেন, 'জামাইবাবু, আপনি চিরটাকাল এক রকম রয়ে গেলেন।'

একটু বাদে বীথি উঠে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নীরজাও গেলেন পিছনে পিছনে।

তখনও ড্রাইভারের সঙ্গে ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ে সুখময়ের বচসা শেষ হয় নি। সাড়ে তিন টাকা ভাড়া উঠতেই পারে না। চুরি করেছে ড্রাইভার। সুখময় আগেই বলেছিলেন, ট্যাক্সি নিয়ে দরকার নেই। এর চেয়ে ঘোড়ার গাড়ি রিক্শাও ভাল। কিন্তু সেবার পরামর্শেই ট্যাক্সি নিয়েছেন তিনি। এখন বেশী ভাড়া দিয়ে তাঁকে মরতে হবে।

জয়ন্ত নীচে নেমে এসেছিল। সে হেসে বলল, 'ভাড়া খুব বেশী নেয় নি; এই রকমই রেট। আপনার কাছে খুচরো না থাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি পিসেমশাই।'

'না না, সে কি কথা! তাই কি হয় নাকি! তুমি কেন দিতে যাবে বাবাজী!'

সুখময় পকেট থেকে টাকা বার করে পুরো ভাড়াটা দিয়ে দিলেন এবার।

জয়ন্ত বাড়ির চাকর হরিদাসকে ডেকে সুখময়দের বাক্স বিছানা তুলে নিতে বলল, নিজেও ধরল হাতে হাতে।

একটু পরে সুখময় মেয়েকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়ালেন। নীরজাকে দেখে বললেন, 'বউদি, চিনতে পারছেন তো? এই কলকাতা শহরেই বার দুই দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে। সেবার মাল কিনতে এসে—। আমার কিন্তু খুব মনে আছে। আপনি বোধ হয় ঠিক চিনে উঠতে পারছেন না।'

নীরজা বললেন, 'বাঃ, চিনতে পারব না কেন? আপনারা না হয় গাঁয়ে থেকে টাটকা ঘি দুধ খান। আমরা অল্পসল্প বাসি জিনিস পাই। কিন্তু তাই বলে স্মৃতিশক্তি যে আমাদের একেবারেই শেষ হয়ে গেছে তা ভাবছেন কেন?'

সুখময় একটু জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি ছি, তা কেন ভাবব?' তারপর

নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে বড়, সুতরাং প্রণম্যা।'

নীরজা তাড়তাড়ি দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ছি ছি, ও কি করছেন! না না, ওসব প্রণাম-ট্রণাম থাক্ সুখময়বাবু। বুড়ো মানুষের আবার প্রণাম কি?'

নিজে প্রণাম করতে না পেরে সুখময় এবার মেয়েকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? মামীমা দাদা দিদি আরও সবাই রয়েছেন। প্রত্যেকে গুরুজন। প্রণাম কর্ ওঁদের।'

একঘর অপরিচিত লোকের মধ্যে সেবা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাপের কথায় সে এবার নীচু হয়ে একে একে সকলকে প্রণাম করে চলল। নীরজা সেবাকে আর বাধা দিলেন না, বরং ওর সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

শুভেন্দুর কাছে এসে তাকে প্রণাম করতে যেতেই সে বলল, 'আমাকে তো আপনি জানেনও না, চেনেনও না। প্রণম্য কি না, তা না জেনেই যে পায়ে হাত দিচ্ছেন?'

এতগুলি কথা কেউ এর আগে বলে নি। সেবা একটু বিস্মিত হয়েই তার দিকে তাকাল। আর তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। পুরুষের এ ধরনের দৃষ্টি তার অপরিচিত নয়। পীরপুরের সেখেদের সেই বাংলো-বাড়িটায় এ দৃষ্টি সে দেখেছে। এর পর কেন যেন শুভেন্দুর পায়ে হাত দিতে সত্যিই তার ইচ্ছে হল না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হল। পাছে অভদ্রতা হয়।

মিনিট কয়েক বাদে বীথি উঠে দাঁড়িয়ে সেবার দিকে চেয়ে একটু অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, 'আমাকে এবার একটু বেরুতে হবে সেবা। থিয়েটারের সময় হয়ে গেছে। ফার্স্ট অ্যাক্টে আমার কোন অ্যাপিয়ারেন্স্ নেই। তাই কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে গল্প করা গেল। শুভেন্দু, চল আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তুমি আসবে বলে থিয়েটারের ড্রাইভারকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

শুভেন্দু নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বীথি সেবার দিকে চেয়ে আর একবার মিষ্টি গলায় হেসে বলল, 'ফিরে এসে ভাল করে আলাপ-পরিচয় হবে। অনেক গল্প করব, গল্প শুনব।' তারপর সুখময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি পিসেমশাই। মা রইলেন, আপনাদের আদরযত্নের ত্রুটি হবে না।'

সুখময় মনে মনে ভাবলেন, কি বখা মেয়েটা! ও যে অ্যাকট্রেস, তা ওর চলন বলন ধরন ধারনেই বোঝা যায়। মুখের কোন লাগাম নেই। মা আর পিসেমশাইকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ওর বাধল না। সকলের সামনে একটি লেজুড় সঙ্গে করে বেরুচ্ছে। এক ফোঁটা লজ্জাও নেই। এ হেন দেবীর সঙ্গে সেবা দিনরাত মিশলে সে যে কি পদার্থে গিয়ে দাঁড়াবে ভগবানই বলতে পারেন। যা হোক, সাবধান করে দিয়ে যেতে হবে ওকে।

কিন্তু মনের কথা মোটেই মুখের ভাবে প্রকাশ হতে দিলেন না সুখময়। তিনিও অভিনয় কম জানেন না। বীথির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এস মা, এস। থিয়েটার করতে যাচ্ছ বুঝি? বেশ, বেশ। তা আমরা একদিন তোমার থিয়েটার দেখব না? হে হে হে—।' টেনে টেনে বোকা বোকা ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

বীথি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'দেখবেন বইকি! কলকাতায় যদি দু-একদিন থেকে যান নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন। চল শুভেন্দু।'

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খানিক বাদে গাড়িতে স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

৭

সুখময় অত দেরি করতে পারলেন না। পরদিন দুপুরের গাড়িতেই বিদায় নিলেন। তাঁর ছুটি মাত্র তিন দিনের। তা ছাড়া তাঁকে কেউ থাকবার জন্যে পীড়াপীড়িও তেমন করল না। করলে থেকে যেতেন। এদের খাওয়াদাওয়াটা বেশ ভাল। রাত্রে ডিম আর ভেটকি মাছ, এবং পরদিন দুপুরে মাংস পোলাও দই মিষ্টি করে কুটুম্বকে আপ্যায়ন করেছেন নীরজা। তার জন্যে সুখময় কৃতজ্ঞ। কিন্তু দু-একটা দিন বেশী থেকে যেতে কি বলতে নেই? ছুটি ফুরিয়েছে, কাজ বেশী—এসব কথা তিনি তো বলবেনই। তবু কুটুম্ববাড়ি থেকে তেমন পীড়াপীড়ি করলে একটা দিন বেশী কি সুখময় আর থেকে যেতে পারতেন না? তা পারতেন। কিন্তু এদের ধরন-ধারনই যেন কেমন আলাদা। যা হোক, এদের খাওয়া-দাওয়া ভাল। শুধু একদিন খেয়েই যে সুখময় এই অনুমান করেছেন তা নয়। এ বাড়ির ঝি-চাকরের সঙ্গে আলাপ করেও সুখময় তা বুঝতে পেরেছেন। বড়লোকের বাড়ি। মেয়েটা খাবে পরবে ভাল। ঝি-চাকর আছে। কাজকর্মও তেমন কিছু করতে হবে না। এখন মাথা ঠিক রেখে সোজা পথে চলতে পারলে হয়। সে জন্যে সুখময় যথেষ্ট বুঝিয়ে শুঝিয়ে গেলেন মেয়েকে। সাবধান হয়ে থাকতে বললেন। আবার শৈলেনবাবু, নীরজা, জয়ন্ত আর বীথি—এই চারজনের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডেকে তাঁদের প্রত্যেকের ওপর মেয়ের ভার দিয়ে গেলেন। শৈলেনবাবু আর নীরজার কাছে সেবার বিয়ের কথাটাও বলে গেলেন: 'একটু লক্ষ্য রাখবেন। যদি কোন ভাল ছেলে-টেলে পাওয়া যায়—মানে বাসাখরচ চালিয়ে খেয়ে পরে থাকতে পারে তা হলেই ঢের। এর চেয়ে বেশী কিছু চাই নে। দিতেথুতে তো কিছুই পারব না। শাঁখাসিঁদুর দিয়েই পার করতে হবে। দেখবেন একটু। কোন

রকম ভাবে যদি এই দায় থেকে উদ্ধার হই, তা হলে জুটল এক সন্ধ্যা খেলাম, না জুটল না খেলাম। বুঝলেন তো, আমার আর কোন চিন্তা থাকে না।'

সেবা তাড়া দিয়ে বলল, 'বাবা, আপনার গাড়ির সময় হয়ে গেল।'

ঠিক বেরুবার আগের মুহূর্তে সেবা বাপের হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট গুঁজে দেয়।

সুখময় বলেন, 'এ কি, এ তো তোর হাত-খরচের টাকা।' সেবা বলে, 'আমার আবার খরচের কি দরকার বাবা! দু-একখানা চিঠিপত্র লেখা ছাড়া আমার কিসের খরচ! তার পয়সা আমার আছে। আপনি এই টাকার সঙ্গে আরও দু-এক টাকা ভরে মার জন্যে অন্তত একখানা আটপৌরে শাড়ি কিনে নিয়ে যাবেন। তাঁর পরবার শাড়ি তো আমাকেই দিয়ে দিয়েছেন।' সুখময় বললেন, 'আচ্ছা, সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। সে আমি ব্যবস্থা করব।'

কিন্তু সেবা টাকাটা জোর করেই বাবাকে গছিয়ে দেয়। বলে, 'আর আপনার নিজের জন্যে একটা ছাতা কিনে নিয়ে যাবেন মনে করে। আর সুদেব, সতী আর ঠাকুরমার জন্যে কিছু ফল-টল। যাওয়ার পথে শিয়ালদাতেই পাবেন।'

আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।—তারপর জলভরা চোখে প্রণাম, ছলছল চোখে মাথার ওপর হাত রেখে নিঃশব্দ আশীর্বাদের ভিতর দিয়ে বিদায়ের পালা শেষ হল।

নিজের ঘরের র‍্যাকের বইপত্র নাড়তে নাড়তে জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন শৈলেন্দ্রনাথ। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করলেন। মনে হল, তাঁর হৃদয় অনেক দিন ধরে উপবাসী রয়েছে। বহুকাল কাউকে তিনি ভালবাসতে পারেন নি, কারও ভালবাসা তিনি এমন করে পান নি। শুধু জ্ঞান নয়, কর্ম নয়, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ চাই। সেই অমৃতই জীবনকে মধুময় করে। তা ছাড়া বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। সে বাঁচা শুধু শারীরিক অর্থে বাঁচা। আরও গূঢ়তর গভীরতর অর্থে বাঁচা নয়।

শৈলেন্দ্রনাথের মনে পড়ে রেণু আর তার ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু

কাপড়চোপড় সুখময়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে হত। এসব দিকে কোনদিন তাঁর খেয়াল থাকে না। এই বাহ্য প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। এই ঔদাসীন্য তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, স্বভাবজাত। কিন্তু অনেকে ভুল বোঝে। রেণুও হয়তো ভাববে, বড়দা কিছু দিলেন না। এখন আর সময় নেই। পরে অন্য কোন উপলক্ষে কিছু কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

প্রথম দু-তিন দিনের মধ্যেই সেবাকে ডেকে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার শুরু করলেন শৈলেন্দ্রনাথ। প্রথম দৃষ্টিতেই সেবার ওপর তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তন্বী সুশ্রী, সুগঠিত দেহাবয়ব। আভরণ নেই বললেই চলে। প্রসাধনে কোন পারিপাট্য নেই। বরং খানিকটা উদাসীনতা আছে। কিন্তু সেই ঔদাসীন্যটুকুও সেবার রূপের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। 'কিমিব হি মধুরাণামাকৃতীণাম্ ন মণ্ডনম্'—মনে মনে আবৃত্তি করেন শৈলেন্দ্রনাথ।

তা ছাড়া তাঁর মনে হয়, ওর সুষমার মধ্যে স্নিগ্ধতা বেশী, কোমলতা বেশী। ওর রূপ লক্ষ্মীর রূপ, যা মনকে স্নিগ্ধ করে, প্রসন্নমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে দেয়। শৈলেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন সেবার রূপের সঙ্গে এক ধরনের বিষণ্ণতাও মিশে রয়েছে। যে বিষাদ জগতের মূলকেন্দ্রে, যে দুঃখ সত্তার সঙ্গে জড়িত এ যেন তারই প্রতীক। শুধু আনন্দে শুধু উৎফুল্লতায় সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ নেই। তার সঙ্গে বিষাদ মিশে থাকলেই তবে তা পরিপূর্ণতা পায়। প্রকৃত সৌন্দর্য একই সঙ্গে আনন্দ দানের সঙ্গে তার পরিণাম, তার অবসানের দুঃখকে মনে করিয়ে দেয়। নিজের মনেই ভেবে চলেন শৈলেন্দ্রনাথ।

অবশ্য সেবার এই বিষণ্ণতার কতকগুলি বাহ্য কারণও আছে। জন্মাবধি দারিদ্র্য আর অভাব-অনটনের সঙ্গে ও জড়িত। তারপর প্রথম যৌবনেই পেয়েছে অপ্রত্যাশিত এক কুৎসিত আঘাত। সে আঘাত যেন বিশ্বসৌন্দর্যকে, তার শিল্প সংস্কৃতিকে বিকৃত পঙ্কিল কলঙ্কিত করে তোলারই প্রতীক। সৌন্দর্যের শুভ্রতাকে মসীলিপ্ত করবার জন্যে তার শত্রু যেন হাত বাড়িয়েই আছে। কামের রাহু, লোভের রাহু বার বার এই সৌন্দর্য-শশীকে কখনও অংশত কখনও পূর্ণভাবে গ্রাস করে চলেছে। এ গ্রাস চিরদিনের জন্যে নয়। এ বিশ্বাস শৈলেন্দ্রনাথের আছে। কিন্তু চাঁদের শত্রু তো রাহু নয়,

চাঁদের শত্রু তার আভ্যন্তরীণ কলঙ্ক। সে যেন সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। যেখানে দেহের রূপ সেখানেই অহঙ্কার, দম্ভ। সাহিত্যে সঙ্গীতে চিত্রে যে যতটুকু শিল্পী, ব্যবহারিক জীবনে সে সেই তুলনায় বহুগুণ দাম্ভিক, অসামাজিক, ক্রোধী, যৌন-জীবনে অসংযত কি অর্থলোভী, না হয় নেশাগ্রস্ত। যে কোন শিল্পের চারদিকে এই যে কলঙ্কবলয় তার বিলয় হবে কবে? মনে মনে ভাবেন শৈলেন্দ্রনাথ।

সেবাকে দেখে তাঁর মনে হয়, সে যে নির্যাতিতা ধর্ষিতা হয়েছে তা যেন মানুষের বিশুদ্ধতা আর অন্তর্নিহিত সহজ শুভ্র সারল্যের ওপর বস্তুতন্ত্রের বর্বর আক্রমণ। ঐহিক সম্পদ যেখানে লক্ষ্য সেখানে এই বস্তুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সবার ওপরে মানুষ সত্য—এ কথা লোকে মুখে বলে; কিন্তু সবার ওপরে বস্তু সত্য—এই যেন তার মনের কথা।

সেবাকে আদর করে কাছে ডাকেন শৈলেন্দ্রনাথ। ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে যান। তারপর পাশে বসিয়ে কি দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সেবা এক সময় বলে, 'বড়মামা, আমাকে ডেকেছিলেন?'

শৈলেন্দ্রনাথ চিন্তার অতলতা থেকে ওপরে ভেসে ওঠেন। লজ্জিত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে বলেন, 'ও হ্যাঁ, তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি বুঝি? তা কি যেন বলছিলাম বল তো?'

সেবা এবার নিজে লজ্জিত হয়। মুখ নীচু করে হাসি গোপন করে বলে, 'কই, তেমন তো কিছু—। কাল কলেজের কথা হচ্ছিল। বড়মামা, আমি কিন্তু কোন কলেজে ভর্তি হব না বলে ঠিক করেছি।'

শৈলেন্দ্রনাথ একটু যেন ক্ষুণ্ণ হন। বিস্মিত চোখে সেবার দিকে চেয়ে বলেন, 'কেন? পড়াশোনা করাই তো ভাল। কলকাতায় যখন একবার এসে পড়েছ—! এখানকার মত এমন সুযোগ সুবিধে কোথায় পাবে? জান সেবা, এই কলকাতা কারও কারও কাছে শুধু বাণিজ্য-নগরী। কিন্তু আসলে এ হল সংস্কৃতির পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের প্রধান কেন্দ্র। এত বই, একসঙ্গে এত বিদ্বান, জ্ঞানবান, গুণবান মানুষের সমাবেশ তুমি বাংলা দেশে

তো ভাল, সারা ভারতেও কোথাও পাবে না। পড়াশোনার এত সুযোগ সুবিধে এখানে আছে—'

সেবা বলল, কিন্তু বড়মামা, 'আমি কলেজে পড়ব না।'

শৈলেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন?'

সেবা বলে, 'ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পক্ষে আমি ঢের বড় হয়ে গেছি।'

শৈলেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসেন। কী মজার কথা! ঢের বড় হয়ে গেছি —এ কথা ছেলেমানুষের মুখেই মানায়। মানুষ যখন সত্যিই বড় হওয়ার মানে বোঝে তখন কিন্তু বলতে পারে না—বড় হয়েছি। তখন সে জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়ায়। কিন্তু কত বয়স্ক মানুষও যে ভিতরে ভিতরে এমন ছেলেমানুষ থাকে তার ঠিক নেই। তারা কখনও সশব্দে, কখনও নিঃশব্দে কেবলই বলে বেড়ায়—বড় হয়েছি, বড় হয়েছি। খ্যাতির দম্ভ, কৃতিত্বের দম্ভ, ঐশ্বর্যের দম্ভ স্তম্ভের মত তাদের ঘিরে রাখে। তা ভেদ করে তাদের কাছে যাওয়া যায় না। এমন কত বন্ধু, বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরের এমন কত মানুষকেই না দেখেছেন শৈলেন্দ্রনাথ। এই দম্ভ সামাজিক জীবনের পক্ষে এক বড় অন্তরায়। হৃদয়বত্তাকে ঢেকে দেওয়ার মত বড় শত্রু আর নেই। বোতলের মদে মানুষকে আর কতখানি নষ্ট করে! কিন্তু এই ভিতরের মদ-এর দু-এক পেগই মানুষকে মাতাল করবার পক্ষে যথেষ্ট। সব চেয়ে স্থূল দম্ভ, অর্থের দম্ভ—বাড়ি গাড়ি বিত্ত প্রতিপত্তির দম্ভ। এই দম্ভ দরিদ্রকে অমানুষ ভাবতে শেখায়। সাংসারিক জীবনে যে অকৃতী, তাকে মূল্যহীন বলে অবজ্ঞা করতে শেখায়। মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে। তাই চাই ধনসাম্য, এমন কি নির্ধনের সাম্যও বরণীয়।

সেবা একটু উসখুস করে। বলে, 'আমি তা হলে এবার যাই। আপনিও উঠুন। অফিসের বেলা হয়ে গেল যে।'

শৈলেনবাবু বলেন, 'ও হ্যাঁ, কি বলছিলাম! ও, তুমিই বুঝি বলছিলে! কি যেন বলছিলে! ও হ্যাঁ, বড় হয়ে গেছ, তাই না? তা একটু লম্বা-টম্বা হয়েছ বটে। তোমার মা ওই বয়সে বেশ বেঁটে ছিল। এখনও বোধ হয় তেমনি আছে?'

সেবা মৃদু হেসে বলে, 'শুধু লম্বা হব কেন বড়মামা, বয়েসেও যথেষ্ট বেড়েছি। মা একটু কমিয়ে বলেন। কিন্তু আসলে তো কুড়ি ছাড়িয়ে গেল। এই বয়েসে ফার্স্ট ইয়ারে কিছুতেই ভর্তি হতে পারব না। এখন ফ্রক-পরা মেয়েরা এই সব ক্লাসে পড়ে। যদি পড়ি আপনার কাছেই পড়ব।'

এতক্ষণ সেবার কথাগুলি গেঁয়ো পাকা পাকা লাগছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় আবার খুশী হয়ে ওঠেন শৈলেন্দ্রনাথ। হেসে বলেন, 'আমার কাছে পড়বে? আমার কি সব মনে আছে? সব সাবজেক্ট কি আর তোমাকে পড়াতে পারব? সে কি আজকের কথা?'

বাইরে থেকে নীরজার গলা শোনা যায়: 'সেবা, তোমার মামাকে বল —এবার দয়া করে চান-টান করতে উঠুন। এর পরে তো আবার নাকে মুখে গুঁজে ছুটবেন।'

সেবা শুধু মামার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শোনে না, কি বিস্মিত হয়ে তাঁর চিন্তামগ্ন মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে না, মামীমার সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে আসে। ঘর-সংসারের কাজেও তার বেশ আগ্রহ এবং দক্ষতা। অবশ্য গাঁয়ে নিজেদের বাড়িতে যে ধরনের কাজ করত এখানে তেমন কাজ নেই। নেই ধানভানা, জ্বালানির জন্যে শুকনো কাঠ পাতা যোগাড় করা, উঠান ঝাঁট দিয়ে গোবর ছড়া দেওয়া, ঘরের মাটির-ভিত লেপা, ইঁদারা থেকে কি পুকুর থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে আসা। তারপর সন্ধ্যার আগে হ্যারিকেনে তেল ভরা ন্যাকড়া দিয়ে চিমনি মুছে পরিষ্কার করা, কাঁচি দিয়ে পলতে কেটে সমান করা, এ-ঘরে ও-ঘরে বিছানা পাতা। অবশ্য মোটা মোটা কাজগুলো সেবার মা তাকে বেশী করতে দিতেন না, পাছে কুমারী-মেয়ের রূপ লাবণ্য কোমলতা নষ্ট হয়ে যায়। ঠাকুরমারও এদিকে লক্ষ্য ছিল। তবু যতটা পারত সেবা মায়ের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে করতে ছাড়ত না। মায়ের যা স্বাস্থ্য, যা চেহারা! সংসারের জন্যে খেটে খেটে যদি শেষ পর্যন্ত মরেই যান, তা হলে কি উপায় হবে! রেণুকণা হেসে বলতেন, আমি অত সহজে মরব না। সে ভয় নেই তোদের। মেয়েছেলে কি সহজে মরে? তাদের কইমাছের প্রাণ।

কলকাতার এই আড়াই শো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট-বাড়িতে তেমন কোন কাজ নেই। যা আছে, রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাজার করা, এমন কি ধোপার আর গোয়ালার হিসাব তাও ঝি-চাকরের হাতে। এখানে জীবন-যাত্রায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য। এখানে কল টিপলে জল পড়ে, সুইচ টিপলে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, মাথার ওপর ফ্যান ঘোরে, গান শোনার জন্যে বৈরাগী-বাউলকে ডাকতে হয় না, রেডিওটি খুলে দিলেই যথেষ্ট। খাবার জিনিস রাখবার জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না; নেট লাগানো সুদৃশ্য মিটসেফ আছে, রেফ্রিজারেটর আছে।

এখানে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। তবু কিছু কিছু কাজ নিজের হাতে টেনে নিল সেবা। রুক্মিণীর হাত থেকে কেড়ে নিল চা আর জলখাবার তৈরির কাজ, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতার সঙ্গে ধোপার আর গোয়ালার হিসেবের খাতাও সেবার হাতে এসে পৌঁছল।

রুক্মিণী হেসে বলল, 'ছোট দিদিমণি আমাদের কি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার মতলব করছেন?'

সেবা বলল, 'ছি, ও কি কথা রুক্মিণীদি! তোমাদের কাজ তোমরা করছ। আমি কতটুকুই বা কি করতে পারি!'

এই দিদি সম্বোধন রুক্মিণীর কানে যেন মধু ঢেলে দিল। সে হেসে বলল, 'ও কথা বললে শুনব কেন! এমন কাজের মেয়ে ভদ্দরলোকের ঘরে আমি দুটি দেখি নি। কি তাড়াতাড়ি কাজই করতে পারেন! হাত দুখানা যেন কলে চলে।'

রুক্মিণীকে রুক্মিণীদি বলায় নীরজা কিন্তু খুশী হন না, তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, 'ওসব কি সেবা! ওসব দিদি-টিদি বলা আমি পছন্দ করি নে। ঝি-চাকরকে কটু কথা বলবে না, অন্যায়ভাবে ধমকাবে না, তাই যথেষ্ট। দাদা দিদি পাতাবার দরকার কি!'

সেবা লজ্জিত হয়ে বলে, 'বয়েসে তো অনেক বড়। শুধু নাম ধরে ডাকাটা যেন কেমন লাগে। আমাদেব গ্রামে—'.

নীরজা বলেন, 'এটা তোমাদের গ্রাম নয়। যে পরিবারে এসেছ তাদের

চাল-চলন মেনে চলা ভাল। উদারতা ভাল, কিন্তু উদারতার নামে আদিখ্যেতা আমার সয় না। এই যেমন ট্রামে বাসে মাঝে মাঝে শুনি কণ্ডাক্টররা দাদা দাদু বলে প্যাসেঞ্জারদের ডাকছে। কি দোকানদার কাস্টমারের সঙ্গে অহেতুক আত্মীয়তা পাতাচ্ছে। আমার শুনতে ভারি বিশ্রী লাগে, এমন কি গা-ঘিনঘিন করে। তুমি কখনও ওভাবে ডাকবে না সেবা।'

সেবা বলে, 'আচ্ছা মামীমা।'

তারপর থেকে নীরজার সামনে রুক্মিণীকে রুক্মিণীদি না বললেও আড়ালে বলে। আর তার ফলে ওদের মধ্যে গোপন আত্মীয়তা আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। চাকর হরিদাসের বয়স বছর ষোল-সতের। কচি শ্যামল গোঁফে ঠোঁট ঢাকা। তাকে সম্বোধনের সমস্যা ওঠে না। কিন্তু তাকেও মিষ্টি করে ডাকে, তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে সেবা। তার ফলে দু দিন যেতে না যেতে মনে হল, হরিদাস যেন তারই দাসানুদাস।

রান্নাঘরেও মাঝে মাঝে শখ করে ঢুকতে লাগল সেবা। রুক্মিণীকে পাশে সরিয়ে রেখে নিজে ধরল হাতা খুন্তি। মায়ের শেখানো দু-তিন রকমের ঝোল ঝাল টক রেঁধে তারিফ পেল শৈলেনবাবুর কাছ থেকে। সেবা যেদিন রাঁধে সেদিন শৈলেনবাবুর পাতে ভাত পড়ে থাকে না। বলেন, 'ছেলেবেলার সেই পুরনো স্বাদ আর গন্ধ ফিরে এসেছে ইলিশমাছের মুড়িঘণ্টে।'

এ কথা শুনে রুক্মিণীর মুখ ভার হয়, নীরজারও মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কারণ শখ করে তিনিও মাঝে মাঝে রাঁধতে যান। কিন্তু বাড়ির কর্তা তো এমন পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন না। এ আর কিছু না, একটি কমবয়সী মেয়ের সামনে তাঁকে জব্দ করবার মতলব।

বীথিকা মায়ের মনের ভাব আন্দাজ করে মুখ টিপে টিপে হাসে। বলে, 'সেবা ওই শাক-চচ্চড়ি রান্নায় হাত পাকিয়েছে মা। কিন্তু পোলাও মাংস কোর্মা কালিয়া আর ডিমের সাত রকমের প্রিপারেশনের কম্পিটিশনে নামুক তো দেখি, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই পারবে না।'

সেবা স্বীকার করে বলে, 'সত্যি বীথিদি, ওসব রান্না আমি ভাল জানি নে। দেবেন শিখিয়ে?'

বীথিকা বলে, 'হুঁ, শেখাব না কচু করব। এসেই তুমি আমাদের বাজার মাটি করে ফেলেছ। পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভুবন-বিজয়! তারপর আরও যদি দু-একটি বিদ্যা শেখাই, আমাদের আর এখানে ঠাঁই হবে না।'

সেবা স্মিতমুখে চুপ করে থাকে। বীথিদির সঙ্গে তার রুচির মিল না হলেও একটু একটু করে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে।

বীথিকা বলে, 'দেখছ মা, বাবার মুখে দিনরাত কেবল সেবা আর সেবা। যেন ভাগনী না হলে 'তাঁহারে সেবিবে কেবা'? সেবা ওঁর ঘর আর টেবিল গুছিয়ে দিয়ে আসবে, তবে তিনি লেখাপড়া করবেন। সেবা ওঁর অফিসে যাওয়ার সময় জামা কাপড় এগিয়ে দেবে, অফিস থেকে ফিরে এলে পরিচর্যা করবে, চা আর খাবার নিয়ে যাবে ওঁর ঘরে। সেবাই একেবারে সব হয়ে বসেছে।'

নীরজা তিক্তবিরক্ত স্বরে বলেন, 'কী যে রঙ্গরস করিস সব সময়, ভাল লাগে না। তুই বাড়িতেও যেন থিয়েটারের সঙ সেজেই আছিস।'

মায়ের মনে এই গোপন ঈর্ষার সূঁচ বিঁধিয়ে বীথিকা মনে মনে কৌতুক বোধ করে মজা পায়। এ দিক থেকে সে বড় নিষ্ঠুর। প্রত্যেকের দুর্বলতার জায়গা তার জানা। কোথায় খোঁচা দিতে হবে বীথি তা ভাল করেই বোঝে।

সেবাকে নিয়ে যেখানে এ ধরনের আলোচনা হয়, সেখানে বেশীক্ষণ সে থাকে না। একটু বাদেই উঠে চলে যায়। হয়তো বলে, 'বীথিদির কথা আপনি ধরবেন না মামীমা। ওঁর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

বীথিকা বলে, 'ঠিক বলেছ। আমি এক মূর্তিমতী অতিশয়োক্তি। অলঙ্কার শাস্ত্রে তারও দাম আছে।'

সেবা উঠে যাওয়ার পর গলা নামিয়ে মার কাছে বলে বীথিকা, 'সেবার সাত্ত্বিকতা আর দু দিন মাত্র। তিন দিনের দিন ও আমাদের দলে আসিবে। আর তার ফলে বাবার কাছে সেবাও অসহ্য হয়ে উঠবে। এটুকু করতে আমার বেশীদিন লাগবে না।'

নীরজা ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'কে তোমাকে তা করতে বলেছে ?' তিনি ধমক দিতে যান মেয়েকে। কিন্তু ধমকটা তেমন যেন জোরালো হয় না।

মনে মনে নীরজাও যেন তাই চান। তাই হোক। সেবাকেও শৈলেন্দ্রের সান্নিধ্য থেকে ছিনিয়ে আনা হোক। ওই এক ফোঁটা মেয়ে যে উড়ে এসে এ সংসারে জুড়ে বসেছে তারও জাত্যন্তর হয়ে যাক। সেও দুর্বিসহ হয়ে উঠুক শৈলেন্দ্রের কাছে। যে মানুষ নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মধ্যে শান্তি আর আনন্দ পায় না, সেই ঘর জ্বালানো পর-ভোলানো পুরুষ চিরকাল নিঃসঙ্গতায় কষ্ট পাক, অনির্বাণ দুঃখের আগুনে জীবনভোর জ্বলে মরুক পুড়ে মরুক।

শুরু থেকেই সেবার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বীথিকার ঘরে। বীথিকার খাটের পাশে আর একখানা ছোট খাট এনে পেতে দেওয়া হয়েছে। এইটাই স্বাভাবিক। কাছাকাছি ওদের বাস। সম্পর্কে বোন। একসঙ্গে খাবে, থাকবে গল্প করবে, ঘুমোবে, তাতেই ওদের আনন্দ। সেবাও এই ব্যবস্থায় খুশী হয়েছে। কিন্তু শৈলেন্দ্রনাথ যেন তেমন খুশী হতে পারেন নি। তিনি স্ত্রীকে ডেকে মনের খুঁতখুঁতি জানিয়ে বলেছেন, 'সেবাকে বীথিব ঘরে দিলে কেন ?'

নীরজা ভ্রূ কুঁচকে বলেছেন, 'তবে কার ঘরে দেব ? আমবা চার জনে চার ঘরে থাকি। তবু তো জয়ন্তের জন্যে আলাদা কোন বেডরুম নেই। সে ড্রয়িংরুমেই শোয়। ঝি চাকরের জন্য করিডোরে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর ঘর কোথায় যে সেবার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কবব ?'

শৈলেনবাবু বলেছেন, 'বীথি তো তোমার ঘরে থাকতে পারে। তোমার ঘর তো যথেষ্ট বড়।'

নীরজা জবাব দিয়েছেন, 'সে ঘরে জিনিসপত্রও যথেষ্ট বেশী। তা ছাড়া বীথির আলাদা ঘরই দরকার। থিয়েটারে কাজ করে। রাত জেগে পাট মুখস্থ করতে হয়। নিজে নিজে রিহার্সাল দেয়। ওর নানা রকম ঝামেলা আছে। তুমি সে সব বুঝবে না। বীথি কি করে আমার ঘরে থাকবে ?'

শৈলেনবাবু বলেছেন, 'তা হলে সেবাকেই তোমার ঘরে রাখ। ওর যখন অত ঝামেলা।'

নীরজা বলেছেন, 'তাই বা কি করে হবে ? আমার ঘর তো বাক্স-

আলমারিতে বোঝাই। আর একখানা খাট পাতবার জায়গা কোথায়। এক বিছানায় পরের মেয়েকে নিয়ে আমি শোব না। তা তুমি যতই ধমকাও আর চোখ রাঙাও। কেন, নিজের মেয়েকে অত অবিশ্বাস কিসের? সে তোমার ভাগনীকে নষ্ট করে ফেলবে সেই ভয়?'

শৈলেন্দ্র কঠিন স্বরে বলেন, 'নীরজা, ওসব কথা থাক্।'

নীরজা বলেন, 'কেন থাকবে? তোমার মনের ভাবটা কি পরিষ্কার করে বল। জান বীথিই সংসারে বেশী টাকা দেয়, বাড়িভাড়াও সেই টানে। তাকে ঘৃণা করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। তুমি তো সব জেনে-শুনেই সেবাকে এখানে আনিয়েছ। নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েকে যে বিশ্বাস করতে পারে না—'

শৈলেনবাবু কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন, 'থাক্, থাক্।' তিনি চান না সেবার সামনে তাঁদের দাম্পত্য কলহ বাধুক। রাগলে নীরজার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, যা নয় তাই বলে। ছেলেমেয়ে চাকরবাকর কিচ্ছু মানে না। শেষ পর্যন্ত শৈলেনবাবুকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়। সেবা আসতে না আসতেই যদি এই কুৎসিত কলহ শুরু হয় লজ্জার শেষ থাকবে না।

সেবা রাত্রে বীথির ঘরে গিয়েই থাকে। শুধু রাত্রে কেন, ওই ঘরই তার থাকবার ঘর বলে কাপড়-চোপড়, আয়না-চিরুনি, মেয়েদের ব্যবহারের আর পাঁচ রকমের টুকিটাকি সেবা ওই ঘরেই সব রাখে। ফলে দিনের মধ্যে সেবাকে বহুবার ও-ঘরে যাতায়াত করতে হয়। শৈলেন্দ্রনাথ সেটা তেমন পছন্দ করেন না।

কি না করলে কি হবে! বীথির সঙ্গে সেবার অন্তরঙ্গতা ক্রমে বেড়েই চলে। সেবা মাঝে মাঝে বীথির সঙ্গে বেড়াতে বের হয়, স্টেশনারি কি শাড়ির দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনে। বীথি তাকে কিছু কিনে দিলে 'নেব না' 'নেব না' করেও শেষ পর্যন্ত নিতে বাধ্য হয়।

একদিন বীথি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে 'পান্থশালা' দেখিয়ে নিয়ে এল। ওই নাটকের নায়িকার ভূমিকা বীথিকার নিজের। ভূমিকাটি সতী-সাধ্বীর নয়।

একটি বিলাসিনী বারাঙ্গনার। পরিণামে সে অবশ্য ভাল হয়ে গেল। ও-নাটক শৈলেন্দ্রনাথ কোনদিন দেখেন নি। মেয়ের লাস্যলীলা দেখতে তাঁর সংকোচ হয়েছে। হোক তা অভিনয়।

এ দিক থেকে নীরজা ঢের আপ-টু-ডেট। তাঁর কোন সংকোচ নেই। তিনি আর্টকে জীবনের সঙ্গে ও-ভাবে মিলিয়ে দেখেন না। যা খেলা তাকে খেলাই ভাবেন। শিল্প তাঁর কাছে উচ্চস্তরের একটি খেলা মাত্র। যা ছায়া তাকে কায়া ভেবে ভয় পান না, লজ্জা পান না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে তিনি মেয়ের অভিনয় মাঝে মাঝে দেখতে যান। বীথিকার অভিনয় দেখে মুগ্ধ দর্শকরা যখন হাততালি দেয়, তিনি তার মধ্যে নিজের কৃতিত্ব দেখেন, নিজেরও সাফল্যের গৌরব অনুভব করেন। একদিন ওদের সঙ্গেই সেবা গেল থিয়েটার দেখতে। মালিক পক্ষ বীথিকার জন্যে একটা বক্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই বক্সে বসে নীরজা তাঁর জামাইবাবু যোগেশ্বর, শুভেন্দু আর সেবাকে নিয়ে দেখে এলেন থিয়েটার। যাওয়ার আগে সেবা অবশ্য শৈলেনবাবুর অনুমতি নিতে এসেছিল। এমন আগ্রহ ছিল ওর কণ্ঠে, এমন অনুনয় ছিল ওর চাওয়ার ভঙ্গিতে যে, তিনি ঠিক 'না' করতে পারেন নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিয়েছেন। না দিলেও হয়তো আটকে রাখতে পারতেন না। নীরজারা হয়তো ওকে জোর করেই টেনে নিয়ে যেতেন। কিংবা জোর করতে হত না। সেবা নিজেই যেত। শৈলেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন সেবার অনেক গুণ আছে; ওর কান্তির কমনীয়তার সঙ্গে স্বভাবের নম্রতা মিশেছে। সেই নম্র সুষমা ওর হাঁটা-চলায়, কথা বলার ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ও গান-বাজনা জানে না বটে, বয়সের অনুপাতে পড়াশোনাতেও বেশীদূর এগোতে পারে নি, কিন্তু ঘরের কাজকর্মে ওর যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। বুদ্ধিও গড়পরতা মেয়েদের চেয়ে বেশী রাখে। এমন একটি নতুন স্বতন্ত্র পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে ওর তত সময় লাগে নি। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও শৈলেন্দ্রনাথকে ক্ষোভের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, সেবার মধ্যে গেঁয়ো কৌতূহল বেশী। এই শহরের থিয়েটার সিনেমা, আরও পাঁচরকমের আমোদ-প্রমোদ, পার্ক ময়দান, বড় রাস্তা, ছোট গলি

সব বিষয় সম্বন্ধে ওর প্রচুর ঔৎসুক্য। বইপত্র কি একটু গভীর বিষয়ের সম্বন্ধে ততখানি উৎসুকতা নেই। ওর চোখ-মুখের শান্ত সৌম্য ভাব দেখে ওকে যতখানি অন্তর্মুখী বলে হঠাৎ মনে হয়, সেবার মধ্যে তত গভীরতা নেই। এ কি ওর বয়োধর্ম, না, যুগধর্ম! এই যুগটাই কি গভীরতার প্রতিকূল? এ যুগ কি শুধু তারল্য আর চাঞ্চল্যে চিহ্নিত?

ওর স্বভাবের আরও একটা লক্ষণ চোখে পড়েছে শৈলেন্দ্রের। সেবা তাঁর কাছে যেমন মুখচোরা শান্ত মেয়ের মত থাকে, বীথি জয়ন্ত আর শুভেন্দুর কাছে তেমন থাকে না। সেখানে ও কথার পিঠে কথার জবাব দেয়। ওর বুদ্ধিমত সাধ্যমত নানা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। এমন কি নিজের ঘর থেকে ওর উচ্চকণ্ঠের হাসির শব্দও একদিন শুনতে পেলেন শৈলেন্দ্রনাথ। ড্রয়িংরুমে বসে জয়ন্ত, শুভেন্দু, বীথি আর তার মার সঙ্গে গল্প করতে করতে সেদিন হেসে উঠেছিল সেবা। নিশ্চয়ই শুভেন্দু। সে শুধু কাটা কাটা কথা বলে সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধূলিসাৎ করে দিতেই পটু নয়। দরকারমত মেয়েদের হাসাতেও জানে। তারপর লুব্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে নারীর সেই হাস্যময়ী রূপ।

কিন্তু আশ্চর্য, সেবার একটু উঁচু গলার কথা, একটু উচ্চ হাসির ধ্বনি শুনতে তো মন্দ লাগে না। নদীর স্রোতের মত এই চঞ্চলতা, ওই কলধ্বনিও ওকে মানায়। এই উচ্ছলতা যৌবনের অঙ্গ—এ কথা অস্বীকার করতে পারেন না শৈলেন্দ্রনাথ। তারুণ্যের এই আনন্দ থেকে সেবাকে বঞ্চিত করে রাখতে তাঁর বিবেকে বাধে। সেবা হাসবে বইকি, আনন্দ আহ্লাদ করবে বইকি। তাই তো ওর বয়োধর্ম। শৈলেন্দ্র তাতে আপত্তি করবেন কেন! তিনি শুধু চান, একজন সৎ আদর্শনিষ্ঠ যুবকের সান্নিধ্যে, তার নির্দোষ কৌতুকে সেবা অমন করে হাসুক। আনন্দের ঝরনার মত কলমুখর হয়ে উঠুক। কিন্তু যে শুভেন্দু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে হাসায়, তারপর বিশেষ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখের সামনে থেকে সেবা নিজেকে সরিয়ে আনুক। তার সঙ্গ দুর্জনসঙ্গের মত পরিত্যাগ করুক।

আকারে ইঙ্গিতে এ কথা বলেছেন শৈলেন্দ্রনাথ। কিন্তু ঠিক স্পষ্ট ভাষায়

বলতে পারেন নি। তাঁর সৌজন্য, শিষ্টাচার, রুচিবোধে বেধেছে। শৈলেন্দ্র তো মেয়েদের পর্দানশীনতা মানেন না। এর সঙ্গে কথা বলো, ওর সঙ্গে বলো না—এ ধরনের অনুশাসন অনাগরিক অভদ্রতা। তা ছাড়া 'কোরো না' 'কোরো না' করে তো এতকাল দেখলেন। স্ত্রীর বেলায় দেখলেন, ছেলেমেয়ের বেলায়ও দেখলেন। কিছু কি লাভ হল? তিনি যা অপছন্দ করেছেন, তিনি যা নিষেধ করেছেন, তাই যেন ওরা বেশী করে করেছে। এবার পদ্ধতি প্রকরণ বদলাতে হবে। এবার নতুন ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট চাই। কিন্তু সেই নতুন ধরনটা কি! উদারতা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতার মাত্রা কতখানি বাড়ালে তা দুর্বলতা বলে নিন্দিত হবে না, শৈথিল্য বলে ধিক্কৃত হবে না।? নিজের মনে ভাবতে থাকেন শৈলেন্দ্রনাথ।

তবু এক ছুটির দিনে চড়কডাঙার পুরনো বন্ধু অধ্যাপক শীতাংশু লাহিড়ীর বাসা থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে বিকেলের দিকে বাড়িতে ফিরে এসে নীরজার ঘরে তাসের আড্ডায় সেবাকে দেখে চমকে উঠলেন শৈলেন্দ্র। মুখ গম্ভীর করে রইলেন। বুকে যেন শেল বিঁধল। নীরজা আর বীথি এক দলে আর শুভেন্দু সেবা মুখোমুখি পার্টনার হয়ে বসে তাস খেলছে প্রশস্ত খাটের ওপর। জয়ন্ত একটা ঈজিচেয়ারে ক্লাউনের পোশাকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

দৃশ্যটা সহ্য হল না শৈলেন্দ্রের। নিজের বইয়ের দেয়ালঘেরা ঘরে সঙ্কীর্ণ পরিসরটুকুর মধ্যে চেয়ারটিতে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তাঁর নিরুপদ্রব স্বভাব ভদ্রতা সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়ে সেবাকে তা হলে ওরা এত দূরে টেনে নামিয়েছে। যে শুভেন্দুকে সেবা গোড়ার দিকে সহ্য করতে পারত না, যার সম্বন্ধে কোন অনুকূল মন্তব্য করে নি, কি প্রসন্ন মনোভাবের পরিচয় দেয় নি, তার সঙ্গে আজ তাস খেলতে পর্যন্ত রাজী হয়েছে সেবা! না, আর ওর উদ্ধারের আশা নেই, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হবার আর আশা নেই শৈলেন্দ্রনাথের। তিনি আবার হেরে যাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী-কন্যা এবারও বিজয়িনী হল। সম্ভোগ আর ইন্দ্রিয়সুখের যে প্রবল টান, সেই টানে ওরা সেবাকে দু হাতে টেনে নিচ্ছে। হার মানা ছাড়া, এই অসম-প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই শৈলেন্দ্রনাথের।

বইপত্রের মধ্যে ফের মগ্ন হয়ে থাকতে চান তিনি। কিন্তু মন ঠিক বসতে চায় না। ভাবেন, সেবাকে ডেকে পাঠাবেন, ওকে তিরস্কার করবেন, সস্নেহে উপদেশ দেবেন আবার: ভাল নয় সেবা, এ শৈথিল্য ভাল নয়। 'প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ, ক্রমে টানে পাপপথে ঘটায় প্রমাদ।'

খানিক বাদে চায়ের কাপ হাতে সেবা নিজেই ঘরে ঢোকে। দূরে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বোধ হয় শৈলেন্দ্রনাথের ডাকবার অপেক্ষা করল। কিন্তু শৈলেনবাবু বুঝেও ডাকলেন না ওকে। ও যে অপরাধ করেছে তা নিজে বুঝুক। লজ্জিত হোক। তারপর ওকে ডাকবেন।

সেবা ভীরু পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। রবারের টী-রেস্টের ওপর নিঃশব্দে চায়ের কাপটি রাখে। তারপর মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শৈলেন্দ্রনাথ দর্শনের বইতে চোখ রেখেও আড়চোখে সেবার দিকে দু-একবার তাকিয়ে দেখেন। সেবা যদি নিজে থেকে চলে যায় বুঝবেন, তাঁর হার হয়েছে। এই কদিনের স্নেহ ভালবাসা কোন দাগই ফেলতে পারে নি ওর মনে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকেন শৈলেন্দ্রনাথ। না, সেবা চলে যায় না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখ অনুশোচনায় ম্লান।

একটু বাদে সেবা বলে, 'চা নিচ্ছেন না যে? আপনি রাগ করেছেন?'

শৈলেন্দ্রনাথের মন এইটুকুতেই খুশী হয়ে ওঠে। নতুন উল্লাসে উৎসাহে ভরে ওঠে মন। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন না, ধরা দেন না। বইয়ের ওপর চোখ রেখে বলেন, 'না, রাগ কিসের? তোমার ওপর রাগের কি অধিকার আছে আমার!'

মাত্র এইটুকু অভিমান। তাতেই সেবার চোখ দুটি যেন ছলছল করে ওঠে। সে বলে, 'ও কি বলছেন বড়মামা? আপনার অধিকার নেই তো কার আছে? আপনিই তো আমাকে দয়া করে এখানে আনিয়েছেন। মা আপনার ভরসাতেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি তো সব জানেন—'

শৈলেন্দ্র এবার নতমুখী সেবার দিকে তাকান। স্নেহকোমল স্বরে বলেন, 'তুমিও যদি সব জান তা হলে কেন—'

সেবা মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'মামীমা, বীথিদি ওঁরা যে আমাকে বার বার বললেন। কিছুতেই ছাড়লেন না। তা ছাড়া জয়ন্তদা খেলতে ভালভাসেন না, ইনটারেস্ট পান না খেলায়। তাই ওঁকে কেউ পার্টনার হিসাবে নিতে চান না। আমি না বসলে ওঁদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে—'

শৈলেনবাবু বলেন, 'কি খেলেছিলে? ব্রীজ?'

সেবা লজ্জিত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় শিখলে? তোমাদের গ্রামে?'

সেবা বলে, 'না। জলপাইগুড়িতে, আমার খুড়তুতো ভাইদের কাছে।'

শৈলেন্দ্রনাথ একটু তরল স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন খেলতে জান? ভাল?'

সেবা কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে চুপ করে থাকে।

শৈলেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, 'কে হারলে? তুমি, না, তোমার মামীমা?'

সেবা হেসে জবাব দেয়, 'মামীমা। তিনি আর বীথিদি দুজনেই তো অত ভাল খেলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেড় হাজার ডাউন।'

কৃতিত্বটা অবশ্য শুভেন্দুর। কিন্তু সে কথা সেবা ইচ্ছা করেই মামার কাছে অনুক্ত রাখে।

শৈলেন্দ্রনাথ একটু ভেবে বলেন, 'তাসখেলাটা অবশ্য সব সময় খারাপ নয়। মাঝে মাঝে রিক্রিয়েশন হিসেবে ওটাকে নিতে পার। কিন্তু ভাল লোকের সঙ্গে খেলবে। সঙ্গটা বেছে নিতে হয়।' হঠাৎ সেবা বলে ওঠে, 'বড়মামা, আপনি একদিন খেলবেন আমাদের সঙ্গে?'

শৈলেন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি? আমাকে কি তোমার খুব ভালমানুষ বলে মনে হল?'

সেবা হেসে জবাব দেয়, 'আপনি যে ভালমানুষ সে কথা মামীমাও বলেন। খেলবেন একদিন?'

শৈলেন্দ্রনাথ চট করে 'না' বলতে পারেন না। হেসে বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে একদিন।'

রুক্মিণী এসে বলে, 'ছোটদিদিমণি, ধোপা এসেছে।'

সেবা বিদায় নিয়ে বলে, 'যাই বড়মামা, আপনার কাপড়টা ছেড়ে দিন। বড় ময়লা হয়েছে।'

সেবা চলে যায়।

শৈলেন্দ্রনাথ ভাবেন, তিনি যদি তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাস খেলতেন তা হলে কি আর ওই শুভেন্দু এসে জুটতে পারত? কিন্তু নীরজা তো তাঁকে তাস খেলতে ডাকে নি! সেই প্রথম যৌবনে দু-চার দিন! তারপর আর মনে পড়ে না। বীথিও না, জয়ন্তও না। ওরাও বাপের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশে নি। মিশতে না মিশতেই নীরজা দু হাতে ওদের সরিয়ে নিয়েছেন, কেড়ে নিয়েছেন। স্বামীর ওপর এ হল নীরজার চরম প্রতিশোধ। সন্তানকে কেড়ে নেওয়া। কিন্তু নীরজা, শৈলেন্দ্রনাথ মনে মনে বলেন, 'কিন্তু নীরজা, কেড়ে নিয়ে তুমিই কি ওদের ধরে রাখতে পেরেছে? আমাকে ওদের পর করে দিয়ে তুমি নিজেই কি ওদের আপন হতে পেরেছ? তোমার ছেলেমেয়ে দেশ আর সমাজকে কি দিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে কি পাচ্ছ তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কারণ তুমি প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে গেছ। আবার তুমি থাবা বাড়িয়েছ আর একটি নিরপরাধ মেয়ের দিকে। যে মেয়ে একমুঠো জুঁইফুলের মত শুভ্র পবিত্র, বর্বররা পায়ে মাড়িয়ে গেছে তবু তার পবিত্রতা যায় নি। সেই পবিত্রতা নষ্ট করবার জন্যে তুমি ফাঁদ পেতেছ। কারণ ওকে আমি স্নেহের চোখে দেখেছি, আর ও আমাকে আশ্রয় করেছে। তুমি তা সইতে পারছ না। কিন্তু ওকে কিছুতেই তুমি কেড়ে নিতে পারবে না।'

সেবাকে কি করে আকৃষ্ট করতে পারেন তাই ভাবতে থাকেন শৈলেন্দ্রনাথ। না, শুধু ভারি ভারি তত্ত্বকথা নয়, শুধু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নির্দেশ নয়, মাঝে মাঝে লঘু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ওর জন্যে করতে হবে। তার জন্যে যদি তাস খেলতে হয়, তাও খেলবেন শৈলেন্দ্রনাথ।

৮

এ এক মজার ব্যাপার! এমন অদ্ভুত মজা সেবা জীবনে দেখে নি। সে জলপাইগুড়িতে গেছে, বালুরঘাটে গেছে, দূর-সম্পর্কের আরও দু-তিনটি পরিবারে অল্প সময়ের জন্যে হলেও থেকেছে। কিন্তু বড়মামার পরিবারের মত এমন একটি পরিবার জীবনে সে এই প্রথম দেখল। এবা একান্নবর্তী হয়েও পৃথকপ্রাণ। বড়মামা এক দিকে, আর মামীমা তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আর এক দিকে। যেন সেই মহাভারতের নারায়ণ আর নারায়ণী-সেনা। সেনাপতির লড়াই নিজের সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে।

এটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি সেবার আছে যে, তাকে দুই কূল রক্ষা করে চলতে হবে। শুধু মামাকেও খুশী করলে চলবে না আবার মামীকেও খুশী রাখলে চলবে না। দুই দলকে তুষ্ট রাখতে পারলেই তার কার্য সিদ্ধি হবে। কোন্ কার্য? না, বিয়ে নয়। পড়াশোনাও নয়। চাকরি-বাকবি। নিজের হাতে রোজগার করবে সেবা। রোজগার কবে বাপ মা ভাই বোনকে পাঠাবে। তাদের বড় কষ্ট। দোকান থেকে বাবা যা মাইনে পান তাতে সংসার চলতে চায় না। বাবা চিঠিপত্র লেখেন কম। কিন্তু মায়ের চিঠিতে, সতীব চিঠিতে সে সব কথা কিছু কিছু থাকে। ভাতের কষ্ট, কাপড়েব কষ্ট, রোগ হলে ওষুধ পথ্য না জোটবার কষ্ট, সংসারে সব কষ্টই আছে। টাকা না থাকলে মানুষের কী থাকে! তাই বড়মামা যখন অর্থকে অকিঞ্চিৎকব বলে রায় দেন সেবার মন তা মানতে চায় না। আবার মামীমা আর বীথিদি যখন অর্থ আর ভোগসুখকেই সংসারের সব বলে প্রচার করেন, সেবার মন তাতেও সায় দেয় না। তাই যদি হবে, ওঁরা সুখী নন কেন? বীথিদিও সুখী নন। মামীমাও সুখী নন। মানুষের মনে সুখ থাকলে তার কথায় অত জ্বালা থাকে না। অমন শ্লেষ আর ব্যঙ্গ তার ভিতর থেকে কাঁটার মত ফুটে বেরোয় না।

শুভেন্দুবাবু স্মার্ট, কিন্তু সু...
অত বিদ্বান বুদ্ধিমান ধনমান রূপবা...
যে তিনি নাকাল হয়েছেন তার ঠিক
কাছে নাকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন।
সেবা। সে সব বুঝতে পারে। পুরুষের চোখে...
কী আছে তা সে দৈবজ্ঞের মত বলে দিতে পারে। বড়
মনে করেন তা সে নয়। তা আর সে নেই। কী করে থ...
অনেক ভুগেছে, অনেক সয়েছে, অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে
পাড়াগাঁয়ে আর দশটি কুমারী মেয়ের মত হত তা হলে এত জানতে ং
কিন্তু দুর্বৃত্তদের হাতে তার তো শুধু কৌমার্যই যায় নি, সেই সঙ্গে অনেক কি...
গেছে। দেব-দ্বিজে বিশ্বাস গেছে, মানুষের ওপর বিশ্বাসও আর অটুট নেই।
এ দিক থেকে বড়মামা বোধ হয় সুখী। কিন্তু ও-ধরনের সুখ চায় না সেবা।
জেনে শুনেও চোখ বুজে থাকা আর এক ধরনের প্রতারণা। বীথিদি ঠিকই
বলে—নিজের মনকে যাঁরা আঁখি ঠারে তারা সব চেয়ে বড় চীট। পরকে
ঠকানোর চেয়েও নিজেকে ঠকানো বেশী খারাপ। এ সব কথা শুনে আবার
বড়মামা বলেন—'দেখ সেবা, ওসব ঝকঝকে এপিগ্রামগুলোর কোনটিই খাঁটি
সোনা নয়। সব গিল্টি, অর্ধসত্য। তার মানে অসত্য। সত্যের সিকিও
নেই, অর্ধেকও নেই। সে সব সময়ে পূর্ণ, অখণ্ড।'

সেবা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার মাথা গুলিয়ে যায়। একবার তাকে বড় মামা টানেন আর একবার বীথিদিরা। দিনের বেলায় বড়মামা যা শেখান, রাত্রিবেলায় বীথিদি তা ভুলিয়ে দেয়। বীথিদির গলা তো তার একার নয়। তার মধ্যে শুভেন্দুবাবুরও কণ্ঠস্বর আছে। শুধু এই বাড়িটিই যে দ্বিধা-বিভক্ত তা নয়, সেবা নিজেও তাই। তার নিজের মধ্যেও আছে নারায়ণ আর নারায়ণী-সেনা। কে জানে প্রত্যেকের মধ্যেই তাই আছে কি না! বড়মামার মধ্যেও কি তাই? না না, সেবা তা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাঁর অশান্তিও তো দিব্যি চোখের সামনে দেখতে পায়। তিনিও-সুখে নেই।

বোধ হয় ওই জয়ন্তদা। মদ
.র কোন স্যাতে নেই, পাঁচে নেই,
। বেশ আছে, কিন্তু সেদিন রাত-
ভুলও ভাঙল। ট্যাক্সির ভেতরেই বমি
জয়ন্তদা। সিঁড়ি বেয়ে কোন রকমে টলতে
.মর মধ্যে আবার বমি। প্রথম প্রথম মাতালকে
ত সেবা। ভাবত, পাগলের মত কামড়ে-টামড়ে দেবে
.খন আর সে ভয় নেই। সে নিজে এগিয়ে গিয়ে ধরল জয়ন্তদাকে।
করল, পরিচর্যা করল। তাকে খানিকটা সুস্থ করে তোলার
.র সেবা বলল, 'খেলে শরীর যখন এত খারাপ হয়, কেন খান ওসব
ছাইভস্ম ?'

'কেন খাই ?'—অমন যে শান্ত স্থির গম্ভীর মানুষ জয়ন্ত, সে হঠাৎ সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল, 'কেন খাই শুনবি সেবা ? 'গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস। না খেলে যে প্রাণে মরি, খেলে অপযশ।' শুধু গাঁজা নয় সেবা, মদ আফিং ভাঙ কোকেন সব। সবেরই এই গুণ। তোদের সাহিত্য, শিল্প, অভিনয় তাদেরও এই গুণ। সব নেশার মধ্যেই আছে বিষ আর অমৃত। বিষ কিসের মধ্যে নেই বলতে পারিস ? তাই বলে কি মানুষ বিষকে ভয় করে ? ভয় করে রেহাই পায় ? সব শালাকে জানি। যত সব ভণ্ড সাধুর দল। কার এমন বুকের পাটা আছে যে, সত্য কথা বলতে পারে ? মনের কপাট খুলে দিতে পারে ? জীবনভোর কুকর্ম অপকর্ম করে তারপর কেবল হোয়াইট ওয়াশিং, কেবল হোয়াইট ওয়াশিং, আর তারাই হয় সবচেয়ে গোঁড়া রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্ত। 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এয়েচি বৃন্দাবন।'

সেবা বলেছিল, 'ছি-ছি-ছি, থামুন জয়ন্তদা, থামুন। বড়মামা হয়তো উঠে পড়বেন। কিন্তু জয়ন্তদা, মানুষের মনের পাপ আর গ্লানি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়ানোই কি সব সময় ভাল ? তাতেই কি আর পাঁচজনের উপকার হয় ?'

জয়ন্ত জবাব দিয়েছিল, 'সত্যের উপকারিতায় যদি বিশ্বাস করিস, নিশ্চয়ই হয়। মিথ্যে কথা বলার চেয়েও সত্য গোপন করা খারাপ। আমি কোন-দিন মিথ্যে কথা বলি নে সেবা। মদ খাই আর তা স্বীকারও করি।'

সেবা একটু হেসে বলেছিল, 'আপনি তা স্বীকার না করলেও লোকে তা টের পেত জয়ন্তদা। কিন্তু এমন অনেক গোপন কথা আছে যা চেপে রাখাই বোধ হয় ভাল। সেবা বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে সেগুলো জোর গলায় বলে না বেড়িয়ে আর পাঁচটা সৎ কাজ করলে তাতে বোধ হয় নিজেরও মঙ্গলও হয়, পরেরও মঙ্গল হয়। সেই হল সত্যিকারের অনুশোচনা, তা না করে অনর্থক পাঁক ঘেঁটে লাভ কি?'

চেঁচামেচি শুনে উঠে এসেছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ। সেবার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বলেছিলেন, 'তুমি এখানে কেন?'

'জয়ন্তদা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বড়মামা।'

শৈলেন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন, 'পড়ুক। তাকে সুস্থ করার, সেবা করার অনেক লোক আছে। তাকে যারা এ পথে টেনে নামিয়েছে তারা এসে করুক। তুমি ঘরে চলে যাও সেবা।'

জয়ন্তদার বিছানা পেতে দিয়ে সেবা চলে এসেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন তার ঘুম হয় নি। মনে মনে ভেবেছিল, বড়মামার এই কঠোরতাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েকে তাঁর কাছে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। এর চেয়ে তিনি যদি নিজে নেমে আসতেন, ওই মদ আর বমি-মাখা ছেলেকে নিজে বসতেন শুশ্রূষা করতে, তুলে নিয়ে চলে যেতেন নিজের বিছানায়, যেমন অবুঝ অশান্ত ছেলেকে লোকে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে যায়, তা হলে হয়তো জয়ন্তদা সত্যিই লজ্জা পেত, তা হলে হয়তো একদিন শোধরালেও শোধরাতে পারত। সেবা মনে মনে জানে জয়ন্তদাও সুখী নয়। একদিন নেশার বস্তু না জুটলেই সে প্রাণে মরে যায়। তার ছটফটানির আর অন্ত থাকে না। তা ছাড়া এক দোষ থেকে অনেক দোষ আসে। টাকা পয়সা সম্বন্ধেও দুর্বলতা এসেছে জয়ন্তদার। কোন মাসেই নিজের মাইনেয় কুলোয় না। শুভেন্দুবাবুর কাছে হাত পাততে হয়।

অফিসের অন্য তহবিলও ভাঙে। সব টাকাই যে বারের বিল শোধ করতে যায় তা নয়। বেশীর ভাগ টাকাই পকেট থেকে হারিয়ে যায়। হিসেবপত্র বলে কিছু নেই। আর এই দুর্বলতার পুরোপুরি সুযোগ নেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর কাছে জয়ন্তদা চোর হয়ে থাকে। শুভেন্দুবাবু নিজেও সাধু নন। তিনি ফার্মের টাকা ভাঙেন। কর্মচারীদের মাইনেপত্র বাকি ফেলেন, হোলসেলারদের টাকা শোধ করতে পারেন না। তাঁর টাকা যায় মেয়েদের জন্যে।

বীথিদি সবই বলেছে। কিছুই গোপন করে নি। শুভেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যাতে কোন রকম মোহ না আসে সেবার মনে, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই বীথিদির। সেবা লক্ষ্য করেছে, শুভেন্দুবাবু তার সঙ্গে দুটো বেশী কথা বললে, কি একটু হেসে কথা বললে বীথিদি ভ্রূ কুঁচকে তাকায়—তার মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ে। তার উদারতার সঙ্গে, কৌতুকবোধের সঙ্গে গোপন ঈর্ষার যুদ্ধ চলতে থাকে। মাঝে মাঝে সেবা মজা পায়, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তার যেন মায়া হয়, দুঃখ হয় এদের জন্যে। যখন মজা পেয়ে হাসে তখন এদের কাছ থেকে যেন অনেক দূরে সরে যায়, কিন্তু যখন সত্যিই দুঃখ পায় তখন মনে হয় এঁরা তার আত্মীয়. অন্তরঙ্গ। তখন আর তার মনে রঙ্গও থাকে না, ব্যঙ্গও থাকে না, তখন কান্না পায়, ভারি কান্না পায়। তখন নিজের দোষ-ত্রুটির কথা মনে পড়ে। তখন মনে হয় সবাই এক। সবাই এক অশ্রুনদীতে স্নান কবতে নেমেছে। তার দরিদ্র বাবা-মার এক রকমের কষ্ট, আবার সম্পন্ন বড়মামার আর এক রকমের কষ্ট। এই দেহধারণের কষ্ট কি কিছুতে দূর হবার নয়? বায়ুভূত নিরাশ্রয় না হওয়া পর্যন্ত কি মানুষের সুখ নেই?

থিয়েটার সেরে বীথিকা বাড়িতে ফিরল। ঘরে এসে বলল, 'কি রে সেবা. ঘুমিয়ে পড়লি না কি?' ইতিমধ্যেই ওরা আপনি আর তুমি থেকে তুমি আর তুইতে এসে পৌঁছেছে। বীথিই জোর করে ঘনিষ্ঠতর করেছে এই সম্বোধন। বলেছে, 'সব জায়গায় পোশাক পরে আছি, তোর কাছে তা থাকতে পারব না। তোর কাছে খোলা গায়ে থাকব। খোলা মনে খোলা প্রাণে, অন্তত খোলা মুখে।'

সেবা নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল। বীথির ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, 'না বীথিদি, ঘুমোঁই নি। তোমার থিয়েটার এতক্ষণে শেষ হল?'

'হ্যাঁ, হল। শেষ না হলে কি আসতে পারতাম? যবনিকা-পতনের আগে কি আর মালিক ছেড়ে দেয়?'

'তবু তোমার আজ একটু বেশী রাত হয়েছে।'

'তা হয়েছে। তুই বুঝি ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে বসেছিলি? আমার সোহাগী!'

খানিকটা আদরে খানিকটা কৌতুকে সেবার কোমল সুন্দর চিবুকটি নেড়ে দিল বীথিকা, তারপর বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে লাগল।

সেবা খাটের ওপর উঠে বসে বলল, 'আজ কেমন জমল অভিনয়? কতগুলো হাততালি শুনলে?'

বীথি আয়নার মধ্যে সেবার ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বলল, 'কাল রাত্রে এতবেশী হাততালি পড়েছিল যে কানে তালা লেগে রয়েছে। তাই আজ শুধু আমার ভক্তদের হাত নাড়া দেখেছি, কিছু শুনতে পাই নি।'

বাথরুম থেকে স্নান সেরে এসে রাত্রিবাস পরে শুয়ে পড়ল বীথি। সেবা অবাক হয়ে বলল, 'ওকি বীথিদি, তুমি খাবে না? একসঙ্গে বসে খাব বলে দুজনের ভাত যে এ ঘরে আনিয়ে রেখেছি!'

বীথিকা অর্ধকৌতুকে বলল, 'ভারি আফসোসের কথা বোন। আমি যে একটু আগে আর একজনের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেয়ে এলাম।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেবার মনে কিসের একটা ছুঁচ বিঁধল: 'খেয়ে এলে? কার সঙ্গে খেয়ে এসেছ? নিশ্চয়ই শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে?'

বীথিকা সেবার চোখে চোখ রাখল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ব্যাপার কি রে? না বললে তুই যদি খুশী হোস তা হলে না বলি।'

সেবা গম্ভীর মুখে একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'এতে খুশী হওয়া না-হওয়ার কোন কথাই নেই। আমি সত্যি কথা বলতে, সত্যি কথা শুনতে ভালবাসি।'

বীথিকা হেসে বলল, 'মিথ্যে কথা। সত্যকে ভালবাসা অতি সহজ নয় আমি বরং মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—এই নীতি সব সময় মেনে চলি। আর সংসারে বেশীর ভাগ সত্যই অপ্রিয় সত্য। তাই মিথ্যে বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।'

সেবা আজ আর কোন তর্ক না করে শুয়ে পড়ল। বীথিকা বলল, 'ও কি, তুই শুয়ে রইলি যে? খাবি নে?'

সেবা বলল, 'না বীথিদি, শরীরটা ভাল লাগছে না।' বলে পাশ ফিরল সেবা।

বীথিকা এক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুলল: 'সেবা, আয়, খাবি আয়। যদি না খাস তাহলে ভাবব সত্যিই তুই শুভেন্দুর প্রেমে পড়েছিস।'

সেবা আর্তনাদ করে উঠল: 'দোহাই বীথিদি, তোমার পায়ে পড়ি। ওই বাজে কথাগুলো আর বলো না। ওসব ছাড়া কি তোমার মুখে আর কোন কথা নেই? এত বলে বলেও ও-কথার রস কি তোমাদের কাছে পচে তাড়ি হয়ে যায় নি?' উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসল সেবা: 'আমাকে তুমি কি ভেবেছ বলতো বীথিদি? আমাকে জোর করে একবার ডাকাতে নিয়ে গিয়েছিল বলে, মাস তিনেক তারা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল বলে তুমি কি ভেবেছ সত্যিই আমার জাত জন্ম গেছে, রুচি প্রবৃত্তি সব আমি ধুয়ে মুছে ফেলেছি? কানা নেই, খোঁড়া নেই, মাতাল নেই, লম্পট নেই, যাকে দেখব তাকেই ভালবাসব?'

বীথিকা সেবার দীপ্ত মুখের দিকে মুহূর্তকাল বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, এ মেয়ে যদি থিয়েটারে নামে ওভারনাইট যশস্বিনী হবে। আশ্চর্য এই শিল্পসৃষ্টি! মানুষ কত কষ্টে কত যত্নে এই শিল্পকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিংবা করলেও ধরে রাখতে পারে না, সেই অপরূপ রূপসৃষ্টি হঠাৎ এক-একজনের মধ্যে কত সহজে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তা ক্ষণিক, ক্ষণ-প্রভ। কিন্তু জীবনের সঙ্গে, প্রতিটি সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ দিন-যাত্রার সঙ্গে এই যে অনর্জিত দক্ষতা, অশিক্ষিতপটুত্ব আর সহজ শিল্প জড়িয়ে

রয়েছে এর বিস্ময় বড় কম নয়। বরং এই শিল্প সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে না বলেই তার মাধুর্য অত বেশী, তীর আকস্মিক আবিষ্কারে অত আনন্দ।

সেবা ফের শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছিল, বীথিকা ওকে জোর করে ধরে এনে টেবিলে বসিয়ে দিল। বলল, 'কাল আমরা ফের একসঙ্গে খাব একপাতে বসে। কিন্তু আজ তুই দেবীকা, আমি সেবিকা। আজ আমি পরিবেশন করব, তুই খাবি। যদি অনশন ধর্মঘট করে থাকিস তবু জোর করে চামচে করে খাইয়ে দেব।'

সেবা হেসে বলল, 'রক্ষে কর, অততে কাজ নেই। আমি কি খুকী যে চামচে করে খাওয়াবে?'

তারপর দুজনের ফের ভাব হল। খাওয়াদাওয়ার পর দোর বন্ধ করল। আলো নিবিয়ে পাশাপাশি খাটে শুয়ে দুই সখীর মত আলাপ করতে লাগল ওরা।

বীথিকা বলল, 'আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম সেবা। কিছু মনে করিস নে, আমাকে মাফ করিস। সময়ে-অসময়ে যাকে-তাকে বেয়াড়া ঠাট্টা করা আমাব এক স্বভাবদোষে দাঁড়িয়েছে। তুই সত্যি অনেক ভাল মেয়ে। তুই এ সংসারে পুণ্যের আলো। তুই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।'

সেবা বলল, 'বীথিদি, এই বুঝি আর একদফা ঠাট্টা শুরু করলে! কোন মানুষই নিষ্প্রাণ বস্তু নয়। সে যা সে তাই। তার খানিকটা আঁধার খানিকটা আলো, খানিকটা কালো।'

বীথিকা বলল, 'তবে যে বলছিলি, কানা খোঁড়া মাতাল বদমাশ! তবে যে বলছিলি রুচি আর প্রবৃত্তির কথা! রুচি আর প্রবৃত্তি দুটি বড় শক্ত কথা সেবা। প্রবৃত্তি কথাটা ঘন ঘন তার রঙ বদলায়, মানে বদলায়। কখনও রুচি প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়, আবার কখনও প্রবৃত্তি রুচিকে নষ্ট করে। আমারও নিশ্চয়ই লাইক্‌স্ অ্যাণ্ড ডিসলাইক্‌স্ আছে। কিন্তু তাতে কানা খোঁড়ায় বাধে না, মাতাল বদমাশেও নয়। আমি যদি কারও মধ্যে তিলপ্রমাণ মিল পেয়ে যাই তার জন্যে পাগলের মত ছুটি?'

সেবা বলল, 'এবার একটা কথা তা হলে জিজ্ঞাসা করি বীথিদি?'

'কর্ না।'

'তোমার আগের স্বামীর সঙ্গে তুমি কি সেই তিলপ্রমাণ মিলটুকুও পাও নি? তা হলে তাকে ছাড়লে কেন?'

বীথিকা বলল, 'এ কথা তুই আরও কয়েকদিন জিজ্ঞেস করেছিস। তিল-প্রমাণই হোক আর তালপ্রমাণই হোক মিলটা শুধু একজনের পেলে তো চলে না, দুজনেরই পাওয়া চাই। আমি হয়তো পেয়েছিলাম কি পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে চাইল না। তার কাছে আমি হলাম ভার, বিশাল এক গন্ধমাদন পর্বত। আমার মধ্যে বিশল্যকরণীর ছিটেফোঁটাও সে খুঁজে পেল না। আর তার ফলে আমি সেই তিলটি হারিয়ে ফেললাম।'

সেবা বলল, 'তারপর?'

'তারপর যা হবার হল। একবার সেই ভাল-লাগার তিলটি হারিয়ে ফেললে ভাল না-লাগার তালটি বড় হয়ে ওঠে। তাতে সব ঢেকে যায়। সে এক বিস্ফোটকের মত। তারপর যা হয়ে থাকে। ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি মারা-মারি আইন-আদালত—বিয়েটাকে ছুরি দিয়ে কেটে দু-টুকরো করা।'

সেবা বলল, 'অত ইশারা ইঙ্গিতে কি গল্প জমে? আর একটু স্পষ্ট করে বল। আমি কারও কাছে বলব না।'

বীথিকা একটু হাসল, 'কার কাছে আবার বলবি! এ কথা শহর ভরে লোকে জানে। তা ছাড়া এ কি আজ আমার একার গল্প? আমরা কেউ ছেড়ে আসি; কেউ ঘরের মধ্যে কাটাকাটি করে মরি। চোখের ওপরই তো দেখতে পাচ্ছিস। আমি একদিন মাকে বলেছিলাম—মা, তুমি আমার পথ নাও। মা ঠাস করে আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিল।'

সেবা বলল, 'ঠিকই করেছিলেন।'

বীথিকা হেসে বলল, 'ওরে আমার লক্ষ্মী মেয়ে! মামার ভাগনী!'

সেবা বলল, 'সে যাকগে। তবু তোমাদের ছাড়াছাড়ির আসল কারণটা বল।'

বীথিকা বলল, 'আমি বলতে পারি, কিন্তু তুই শুনতে পারবি নে। কানে আঙুল দিবি। **He was not sufficiently potent for me.** আমি

শুধু sensual potencyর কথা বলছি নে ; সেটা সব সময়ে বড় কথা নয়। তার চেয়েও বড় জীবনীশক্তি। প্রাণবন্যা। সে বন্যা আমার মধ্যে ছিল, তার মধ্যে ছিল না। তাই তার ভয় হল, সে ভেসে যাবে। শুধু সে নিজে নয়, তার পারিবারিক প্রেস্টিজ, কুল মান শীল সব। তাই সে আমাকে বাঁধতে চাইল। ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে তার নাম ছিল। নদী-শাসনবিদ্যা সে বিদেশ থেকে শিখে এসেছে। কিন্তু সে বিদ্যায় নারী-শাসন চলল না। ফল কি হল তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। মিটল তোর কৌতূহল ?'

সেবা বলল, 'না। বেশ, তোমার আগের স্বামীর কথা বেশী না বলতে চাও না বললে। শুভেন্দুবাবুর কথা বল। তাঁর সঙ্গে মিল তো তোমার তিল-প্রমাণ নয়, বোধ হয় তালপ্রমাণই। তবু তাঁকে কেন বিয়ে করছ না ?'

বীথিকা বলল, 'তোর এ কথার জবাব দেওয়া আরও শক্ত। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু সে নিজেও এক ঘরপোড়া গরু। তার স্ত্রী বিয়ের এক বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। তারপর সে বুঝি বছর-দুই উদাসীন হয়ে ছিল। তারপর প্রকৃতি শোধ নিল। 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী !' তার স্ত্রীর সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে শুধু একান্ন পীঠ নয়, একান্ন হাজার পীঠ সৃষ্টি করল। মরে গিয়ে সে এমনি করে প্রতি-শোধ নিয়েছে।

সেবা বলল, 'কিন্তু শুভেন্দুবাবুর সমস্ত জ্বালা তুমি তো জুড়িয়ে দিতে পার বীথিদি'।

বীথিকা বলল, 'পারি কি না সে পরীক্ষায় নামতে ভয় হয় সেবা। আমরা একজন আর একজনকে বড় বেশী জেনে ফেলেছি। দোষ ত্রুটি দুর্বলতা কিছুই আর বাকি নেই। কোন রহস্যই আর অবশিষ্ট নেই যেন। তা ছাড়া শুভেন্দু আমার মত মেয়ের পক্ষেও বড় বেশী রোবাস্ট। ওর সেই প্রাণপ্রাচুর্য মাঝে মাঝে আদিম বর্বরতায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভয় হয় সেবা, যদি সহ্য করতে না পারি ! আমি তো আর আত্মহত্যা করবার মত মেয়ে নই, হয়তো হত্যাই করে বসব। তারও সে ভয় আছে। সে প্রাণের ভয়ে বিয়ে করে না, আমি ফাঁসির ভয়ে।'

অন্ধকার ঘরে দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। দেয়ালে টাঙানো হাতঘড়ির টিক টিক শব্দ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। সেই শব্দে কিছুক্ষণ কান পেতে রইল বীথিকা। বনাতের মত পুরু অন্ধকার যেন সারা ঘরখানা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। উঠে গিয়ে যে দুটি একটি জানালা বন্ধ ছিল তা খুলে দিল। খানিকটা হাওয়া এল, তারা-ভরা আকাশের এক ফালি চোখে পড়ল।

এ বাড়ীতে ওপরে নীচে আরও তিনটি ফ্ল্যাট আছে। কোন ঘরে কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু বীথিকার চোখে। বড় অসহায় লাগে এই সব মুহূর্তে, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। পরিত্যক্ত আদি-অন্তহীন এক মরুভূমির মধ্যে বীথির নিজেকে মনে হয় সঙ্গাতুর এক নিশাচরীর মত।

হঠাৎ বীথির মনে পড়ে যায় সেবার কথা। সেবা আছে, পাশের খাটেই অস্তিত্বময়ী আর এক প্রাণকণা রয়েছে।

বীথি ভরসা পেয়ে তার কাছে যায়। আস্তে আস্তে ডাকে, 'সেবা, ও সেবা, তুই কি ঘুমিয়ে পড়লি ?'

সেবা সাড়া দিয়ে বলল, 'না বীথিদি। ঘুম বোধ হয় আজ আর চোখে আসবে না। এত চেষ্টা করলাম—'

বীথি খুশী হয়ে বলল, 'তা হলে আর চেষ্টা করে কাজ নেই। কবিতা বনিতার মত নিদ্রাও যখন নিজে থেকে আসে তখনই সুখদা। ঘুম যখন আসবে না, আয়, বসে বসে গল্প করি। এতক্ষণ আমার কথা শুনলি, এবার তোর কথা বল্।'

সেবা বলল, 'আমার কথা আরও ভয়ঙ্কর, সে আরও আদিম অন্ধকার যুগের কথা।'

বীথি বলল, 'তা হোক, তুই বল্।'

সেবা বলল, 'কিন্তু বীথিদি, সে কথা আলো জেলে বলতে আমার লজ্জা হয়। অন্ধকারে বলতে ভয় করে। যেন পৃথিবীর যত রাজ্যের অন্ধকার আমাকে এসে ফের ঘিরে ধরে।'

বীথিকা বলল, 'তোর কবিত্ব থামা। কিসের অন্ধকার ? কিসের ভয় ?

সুইচ টিপলেই আলো জ্বলবে। এ তো তোদের পাড়াগাঁ নয় যে দেশলাই হাতড়ে মরতে হবে। তা ছাড়া আমি তোর কাছে বসে রয়েছি সেবা। তুই তো আর একা নোস, আমিও একা নই। সবচেয়ে ভয় মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একা, পরিত্যক্ত মনে করে।'

সেবার বিছানার পাসে এসে বসল বীথিকা। অন্ধকারেই পরম স্নেহে ওর পদ্মকোরকের মত হাতখানা তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর বলল, 'এবার বল্।'

সেবা বলল, 'কিন্তু বীথিদি, সে সব কথা তো কিছু কিছু কাগজেও পড়েছ।'

বীথি বলল, 'দূর বোকা মেয়ে! আমি কি কাগজ পড়ি না কি? থিয়েটারের দিন শুধু দেখে নিই, বিজ্ঞাপনের পাতায় নিজের নামটা সকলের মাথার ওপরে ছাপা হল কি না! তা ছাড়া তোদের ওই সব মফস্বলের খবর শহরের কাগজে ভাল করে সব বেরোয়ও নি। শুধু রায়ের কথাটাই শুনেছিলাম। তুই বল্ সেবা।'—ঘরের ভারমন্থর গুমোট আবহাওয়াটা বীথি অনেকখানি লঘু করে দিল।

সেবা একটু ভেবে গোড়া থেকে বলল তার কাহিনী।

সেবাদের চণ্ডীপুরের উত্তর দিকে একটা খাল। সে খাল এখন ভারত-পাকিস্তানের সীমানা। বর্ষার সময় জলে ভরে উঠে, শীতে গ্রীষ্মে শুকনো খট খট করে। সেবাদের বাড়ির উত্তর সীমান্তে দুটো পোড়ো ভিটে আর বাঁশবাগানের ভিতর দিয়ে যে সরু ছায়াচ্ছন্ন কুমারীর সিঁথির মত পায়েহাঁটা একটি পথ চলে গেছে, সে পথ শেষ হয়েছে ওই খালপাড়ে। সেখানে আমগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় ওপারের সিকদার-বাড়ি। সেবারা যখন ফ্রক পরত তখনই সেই বাড়ির অবস্থা পড়ন্ত। আতাহার সিকদার তখন বুড়ো। তার বাবরি পাকা, দাড়ি পাকা। বাতাসে ফুর ফুর করে সে দাড়ি ওড়ে। কিন্তু সে ওড়ার মধ্যে উল্লাস নেই, গৌরব নেই। সে দাড়ি পরাজয়ের সাদা নিশান। আতাহার মিঞা মামলা মোকদ্দমা করে সব জমিজোত খুইয়েছেন। এখন শুধু ওই বাড়িখানাই সম্বল আর আশেপাশের দু-একটি ভিটে আর আমবাগান। এই আতাহার সিকদার কত গরু কিনেছেন, ঘোড়া কিনেছেন, বাইচের নৌকো

কিনেছেন, সুন্দরী মেয়ে দেখে দেখে বিয়ে করেছেন, আবার সামান্য অপরাধে তাদের তালাক দিয়েছেন, যন্ত্রণা দিয়ে কষ্ট দিয়ে কাউকে বা একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন তার ঠিক নেই। এখন সে সব শুধু গল্প, শুধু স্মৃতি আর স্বপ্ন। বেশীর ভাগই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু খালপাড়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ওই সিকদারবাড়িটি দেখতে বড়ই ভাল লাগত সেবার। খালের জলে ওদের বাড়ির জামরুলগাছের ছায়া পড়ত। সেই গাছে যে ঘোড়াটি বাঁধা থাকত, যার গয়ের রঙ কোথাও সাদা, কোথাও লাল, কখনও লেজটা একটু একটু নড়ত, কখনও থাকত স্থির হয়ে, তারও ছায়া পড়ত জলে। আর সেই ঘোড়ার কাছে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াত তেরোচোদ্দ বছরের একটি কিশোর ছেলে। তার রঙ সাদাও নয়, লালও নয়, হলদে। লোকে আতাহারের ঘোড়ার দিকে না তাকিয়ে তার ওই ছেলের দিকে চেয়ে থাকত। বুড়োবয়সে এমন চমৎকার ছেলের বাপ হয়েছেন আতাহার মিঞা! বাহাদুরি বটে! ছেলেবেলা থেকেই শুধু রূপে নয়, কথাবার্তায় লেখায় পড়ায় সকলের তারিফ পেতে লাগল আতিকর। তখন কতই বা বয়স সেবার! সাত-আট বছরের বেশি নয়। কিন্তু তখন থেকেই নামটি ভারি মিষ্টি লেগেছিল সেবাব কানে। তাদের পাড়ার খগেন যোগেন যদু কাতিক গণেশ মধুর চেয়ে অনেক—অনেক মিষ্টি। মিষ্টি আর নতুন আর রহস্যময়। আতিকরের ডাকনাম ছিল সোনা—সোনা মিঞা। আতাহারের পাড়াপড়শীরা সবাই বলত, বুড়ো মিঞা, এবার আপনার দুঃখ সারল। আকাশের চাঁদকে আপনি শুধু হাতে না, বুকের মধ্যে পেয়েছেন। আপনার কষ্ট কিসের? ও আপনার সব ফিরিয়ে আনবে। বুড়ো আতাহার সিকদার আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলতেন, সব তাঁর ইচ্ছা, সব সেই খোদাতালার দোয়া। ওর আর কিছু ফিরিয়ে আনার দরকার নেই। ও শুধু মানুষ হোক, সেই দোয়াই করবেন আপনারা, নুনভাত খাক, শাক-ভাত খাক, গাড়ি ঘোড়ায় না চড়ুক, কিন্তু যেন সোজা পথে মাথা খাড়া করে চলে, কবরের তলায় শুয়ে শুয়ে আমি ওর সেই পায়ের শব্দ শুনব আর শান্তিতে ঘুমোব।

প্রথমে মনে হয়েছিল আতাহারের আশা বুঝি পূর্ণ হল। গাঁয়ের এম. ই.

স্কুল থেকে জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়ে বৃত্তি পেল আতিকর। সেক্রেটারি লাল ফিতেয় বাঁধা সোনার মেডেল তাকে উপহার দিলেন। সেই উপহার আতিকর দেখাতে নিয়ে এল সেবার বাবাকে। গোড়া থেকেই সুখময়দের সঙ্গে ওদের একটু ধর্মসম্পর্ক ছিল। আতিকর চাচা বলে ডাকত সেবার বাবাকে। আতাহার মাঝে মাঝে দুধের হাঁড়ি পাঠাতেন, রসের হাঁড়ি পাঠাতেন। একবার সস্তায় দু বিঘা জমিও রেখে দিয়েছিলেন। সুখময় গরিব মানুষ, তত্ত্ব আর উপহার পাঠাতে পারতেন না। তবে মামলা-মকদ্দমায় আতাহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। হলফ করে সত্য কথাও বলতেন আবার দরকার হলে অনুরোধ উপরোধে কিছু কিছু মিথ্যাও যে না বলতেন তা নয়। আর খাতির করতেন আতিকরকে। তিনিও বলতেন, সোনার চাঁদ ছেলে।

মেডেল নিয়ে আতিকর যখন সেবাদের বাড়ীতে এল তার কৃতিত্ব দেখে সবাই খুশী। সেবার ঠাকুরমাকে বাবাকে মাকে আতিকর মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করল। মেডেলটা হাতে হাতে ফিরতে লাগল সকলের। কাঁচা পেয়ারা খেতে খেতে, এক মাথা কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল নিয়ে ছুটে এল সেবা। বলল, 'কই, দেখি, মেডেলটা দেখি!' আতিকর হেসে মেডেলটা তার হাতে তুলে দিল। গলার সরু চেনহারে সেই মেডেলটা মিশিয়ে দেখতে দেখতে সেবা বলল, 'চমৎকার একটি লকেট হয়—না, আতিকরদা?'

আতিকর হেসে বলল, 'তা হয়। রাখবে নাকি? তা হলে রেখে দাও না।'

তখন সেবার বয়স দশ-এগারোর বেশী নয়, পরনে ডুরে শাড়ি। ঝাঁকড়া চুলগুলি খোপা করে রাখতে চায়, বার বার তা খুলে গিয়ে খসে খসে পড়ে।

আর আতিকরের বয়স ষোল-সতেরো। ও একটু বেশী বয়সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই সেবাদের বাড়িতে আতিকর কখনও লুঙ্গি পরে কি খোলা গায়ে আসত না। ধুতি-পাঞ্জাবি কি শার্ট পরে আসত। ওর চালচলনে, কথায় বার্তায় সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের শিষ্টাচার

ছিল। কিন্তু ওকে খালি গায়ে দেখতেও সেবার মন্দ লাগত না। মনে হত ও যেন এক রঙিন পাঞ্জাবি পরে আছে। •

আতিকরের সেই কথায় সেবা ভারি লজ্জা পেল। দূর—বলে সেই হলদে রঙের মেডেল আর আধখানা-খাওয়া সবুজ রঙের পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ঘরে। পেয়ারাটা বুঝি আতিকরের গায়েই গেগেছিল। কিন্তু সে তা গায়ে মাখল না। হো-হো করে হেসে উঠল। সেবার ঠাকুরমা ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি ছি ছি! ও কি অসভ্যতা!'

তারপর বছর চারেক ধরে আতিকর প্রায়ই আসত, এম. ই. স্কুল থেকে সে তখন হাই স্কুলে গেছে—সেই স্কুলের গল্প করত। ঢাকা বারান্দার তক্তপোশে বসে কখনও বা সেবাকে অঙ্ক কষাত। চমৎকার মাথা ছিল অঙ্কে। সেবার মা সুন্দর একখানা বেতের সাজিতে করে ওকে শীতের দিনে মুড়ি আর পাটালিগুড় খেতে দিতেন। গ্রীষ্মে আম কাঁঠাল আনারস তরমুজ। আতিকর সাজিখানা ধুয়ে আনতে গেলে সেবার মা বাধা দিতেন, না না, থাক্ থাক্। ও তোমাকে ধুতে হবে না বাবা।

আতিকর খুশী হত, সেবাদের বাড়িতে সে যতখানি খাতির আর আদর-যত্ন পেত তা পাড়ার কোন বামুন কায়েতের ছেলেও পেত না। এই সম্মান দিত তার রূপকে বিদ্যাকে মেধাকে। আতিকর বলত, 'আচ্ছা, কাকীমা, সোনা নামটা হিন্দুরও হয়, মুসলমানেরও হয়, তাই না?'

সেবার মা হেসে বলতেন, 'তা তো হয়ই বাবা। সোনার কোন জাত নেই। সোনা হিন্দুর ঘরেও আছে, মুসলমানের ঘরেও আছে।'

আতিকর বলত, 'তা হলে আমাকে আমার ডাকনাম ধরে সোনা বলে ডাকবেন কাকীমা।'

সেবার মা বলতেন, 'আচ্ছা, তাই ডাকব।' কিন্তু ডাকবার সময় কথাটা তাঁর মনে থাকত না। সেবাকে বলতেন, 'তুই বরং ওকে সোনাদা বলে ডাকিস।'

কিন্তু সেবা তা মোটেই ডাকত না। আতিকরদা বলত। আর ওর মনের দুর্বলতা টের পেয়ে সোনা মিঞা বলে ঠাট্টা করত।

ইতিমধ্যে সেবার ঠাকুরমা খুঁত খুঁত করতে শুরু করেছিলেন। আতিকরের এ বাড়িতে বেশী যাওয়া-আসা তিনি পছন্দ করতেন না। সেবার সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করতেন। মাকে ডেকে বলতেন, 'বউমা, তোমার মেয়ে এখন বড় হয়েছে। ও যেন যখন-তখন যেমন-তেমন ভাবে আতিকরের সামনে আর না বেরোয়। ভিন্ন জাত ভিন্ন ধর্ম। ছি ছি-ছি, পাড়ার লোকে এরই মধ্যে গা-টেপাটেপি শুরু করেছে। নিজের মেয়েকে তুমি যতখানি কচি খুকী বলে ভাব, লোকে তা ভাবে না। ও কি কম ধিঙ্গি হয়েছে না কি? বিয়ে দিলে যে এতদিনে ছেলের মা হয়ে যেত।'

তাঁর ধমকানিতে কাজ হল। সেবার বাবাও আতিকরের সামনে তাকে বেশী বেরোতে বারণ করে দিলেন।

আতিকর এলে এখন আর ঢাকা-বান্দান্দায় তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খোলা উঠানে জলচৌকি পেতে দেওয়া হয়। তার সামনে সেবা আর বেরোয় না। সতী সুদেব তাকে ঘিরে বসে গল্প করে। কিন্তু আতিকরের চোখ কাকে খোঁজে, মন কাকে চায় তা কারও বুঝতে বাকি থাকে না।

ঠাকুরমা তা দেখে ওর আড়ালে বলেন, 'চোখ তো নয়, যেন চোরের চোখ। কেমন টালুমালু তাকায় দেখ।'

খোঁচাটা সেবার বুকে গিয়ে বেঁধে। আতিকর যে এ বাড়িতে অনাহূত আসে, অমন করে তাকায় এ লজ্জাটা যেন তারও।

আতিকর অবশ্য ব্যাপারটা না বুঝতে পারে তা নয়। যাওয়া-আসা অনেকটা কমিয়েও দেয়। কিন্তু একেবারে না এসে পারে না।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। সেদিন সেবাদের বাড়িতে পৌষ-লক্ষ্মীর পুজা। সতী-সুদেবের কাছে আতিকর তা শুনেছিল। বাঁশ আর বেতে তৈরি চমৎকার একটি সাজিতে করে ভোরবেলায় সে একরাশ টগর গাঁদা নিয়ে এসে হাজির। ঠাকুরমা দেখে বললেন, 'এত ফুল দিয়ে কি হবে আতিকর?'

আতিকর একমুখ হেসে বলল, 'আপনাদের পুজোর জন্যে এনেছি ঠাকুরমা। ফুলগুলো আমাদের নিজেদের বাড়ির। আমি আর মা যত্ন করে গাছ লাগিয়েছি। সাজিটাও আমি নিজে তৈরি করেছি ঠাকুরমা।

বোনা শিখেছিলাম ও-পাড়ার মোনাজদ্দির কাছে। দেখুন তো কেমন হয়েছে?'

ঠাকুরমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভাল।'

সাজিটা তাঁর হাতে দিতে যাচ্ছিল আতিকর। ঠাকুরমা বললেন, 'রাখ, নীচে নামিয়ে রাখ।'

আতিকর অপ্রস্তুত হয়ে ফুলের সাজিখানা গোবর-লেপা উঠানে নামিয়ে রাখল।

ঠাকুরমা বললেন, 'আতিকর, তোমাকে একটা কথা বলি। এতকাল হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে এলে। তুমি কি আমাদের আচার-নিয়ম কিছু জান না? তুমি কি ভেবেছ তোমার সঙ্গে আমরাও মুসলমান হয়ে গেছি? গোঁফ গজিয়েছে, দাড়ি গজিয়েছে, কিন্তু তোমাদের ছোঁয়া ফুল যে আমাদের পুজোয় লাগে না সে বুদ্ধি কি তোমার আজও হয় নি?'

আতিকরের মুখখানা লাল টুকটুক করতে লাগল। সে বলল, 'কিন্তু ঠাকুরমা, সেবার কালী হাজবাব বিল থেকে নৌকায় করে পদ্মফুল এনে দিয়েছিলাম, তা তো পুজোয় লেগেছিল। তিন বাঁক উজান বেয়ে নলটুনি ফুল এনে দিয়েছিলাম, তা তো কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় লেগেছিল। সত্যি, চোদ্দ পুরুষ পাশাপাশি বাস করেও আমরা আপনাদের বুঝতে পারলাম না।'

আতিকর ফুলগুলি রেখেই ফিরে চলে গেল। সেবার ঠাকুরমা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে উলটে ফেললেন সাজিটা। বললেন, 'নেড়ের কি আস্পর্দা দেখ!'

সেবা আর থাকতে পারল না। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু ঠাকুরমা, ফুলগুলো অমন করে মাড়িয়ে ফেললে কেন?'

ঠাকুরমা বিকৃতমুখে বললেন, 'না, মাড়াব কেন! ও ফুল তুই গলার মালা করে পর্। ফুল যে কোন্ লক্ষ্মীর জন্যে এসেছে তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই।'

সেবাকে স্কুলে থেকে ছাড়িয়ে আনা হল। কারণ তার যাতায়াতের

পথে আতিকরকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদিও সেবা তার সঙ্গে আর কথা বলে না।

তারপর আতিকরের পরিবারে আরও দুর্দশা দেখা দেয়। বুড়ো আতাহার সিকদার হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা যান। তার আগেই ছেলের পতন শুরু হয়েছে। ম্যাট্রিকুলেশন সে কোনরকমে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করল। গাঁয়ের আর গঞ্জের যত সব খারাপ ছেলের সঙ্গে আড্ডা। সে বিড়ি সিগারেট খায়। দশ আনি ছ আনি চুল ছাঁটে। লুঙ্গি পরে আড্ডা ইয়ারকি দিয়ে বেড়ায়। আর তার মত হিন্দুবিদ্বেষী ছেলে দেশে দুটি নেই। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদলের সে এক বড় পাণ্ডা। তার বাড়িতে রোজ তাদের বৈঠক বসে। মাথার ওপর বাপ নেই, মা ঘরের মধ্যে কখনও কাঁদেন, কখনও ধমকান। কিন্তু আতিকর তা মোটেই গ্রাহ্য করে না। বলে, 'তোমার যদি এখানে থাকতে ভাল না লাগে, মনের মানুষ খুঁজে নিয়ে নিকে বসলেই পার।' এ কথা শুনে মা ছেলেকে গাল পাড়েন—'তুই মর্, তুই মর্, তুই মর্।'

আতিকর দূরে দাঁড়িয়ে হাসে আর ছড়া মিলিয়ে বলে, 'তুই নিকে কর্।' কোর্টে সাধারণ এক কেরানীর চাকরি নেয় আতিকর। যে ছেলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে বলে সবাই আশা করেছিল তার এ কি দুর্গতি! আজকাল সবাই বলে, আতিকর ঠিক তার বাপের মতই হয়েছে। বাপের মতই কুচক্রী বদমাশ আর শয়তান। তবে বাপের শক্তি সামর্থ্য ঐশ্বর্য কিছুই পায় নি। ও হয়েছে বাঘের বাচ্চা বাগডাশ।

সেবার বাবা মাঝে মাঝে দুঃখ করেন, সত্যি, ছেলেটা কি হতে কি হয়ে গেল! আজকাল দেখা হলে চিনতেই পারে না। সেবার মা চুপ করে থাকেন।

তারপর সাকিনা বেগম একদিন নিজে এলেন সেবাদের বাড়িতে। ছোট এক বোনপো সঙ্গে। বোরখায় ঢাকা সর্বাঙ্গ। সেবাদের বাড়ির অন্দরে এসে মুখের ঢাকা খুলে ফেললেন। সে মুখ দেখে আর একজনের মুখের কথা মনে পড়ে গেল সেবার। আতিকর ঠিক মায়ের রূপ পেয়েছে আর বাপের স্বভাব।

সাকিনা বেগম অনেক দুঃখ করলেন ছেলের জন্যে। ওই ছেলের মুখের দিকে চেয়েই তিনি স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেছেন, অনেক লোভ প্রলোভন সংবরণ করেছেন। কিন্তু সব বৃথা। জীবনভোর তিনি কেবল ভস্মেই ঘি ঢাললেন।

কাঁদতে লাগলেন আতিকরের মা। সেবার মার হাতখানা ধরে বললেন, 'দিদি, আপনি ওকে আর একবার কাছে ডাকুন। আপনি দোয়া করুন ওকে। আমাকে ও দু চোখ পেতে দেখতে পারে না। আপনি ওর মায়ের কাজ করুন।'

সেবার মা বললেন, 'আতিকরের কথা ভেবে আমারও দুঃখ হয়। এমন রত্ন, কিন্তু কী হয়ে গেল! আচ্ছা, ওকে আমার নাম করে পাঠিয়ে দেবেন। একবার কেন, শতবার ওকে বোঝাব। ওর মতিগতি যদি ভাল হয় তাতে কার না সুখ দিদি?'

খানিক বাদে সাকিনা বেগম আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন। সেবাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'সুখে থাক মা।'

তাঁর আশীর্বাদ কি অদ্ভুত ভাবেই না ফলল।

এর আগে আতিকর সেবার সঙ্গে কয়েকবার নির্জনে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেবা তাতে রাজী হয় নি। সাড়াও দেয় নি। ভরসা পায় নি সেবা। তার ভয় করেছে। আতিকর তো আব সেই আতিকর নেই। তা ছাড়া কেউ জানতে পারলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

কিন্তু আজ যখন মা তাকে আসতে বললেন, সেবার ভালই লাগল। মনে মনে সে প্রার্থনা করল, ও আসুক, ও আসুক। যদি দেখা হয়, সেবা শুধু একটি কথা বলবে—'জীবনটাকে কেন অমন করে মাটি করছ? পুরুষ মানুষের জীবনের দাম যে অনেক বেশী। তুমি যদি সৎ হও, ভাল হও, তাতে যে সকলের গৌরব।'

সে আসুক, সে আসুক। সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে সেবা তার সঙ্গে কথা বলবে। বলবে এই কথাগুলি।

শেষ পর্যন্ত সে এল। একা নয়, সদলে। তার বছর তিনেক আগে দেশ

বিভাগ হয়ে গেছে। বিভাগ তো নয়, ব্যবচ্ছেদ। ক্ষতচিহ্নের জ্বালা থামে নি। থেকে থেকে জ্বলে উঠছে। এখানে হাঙ্গামা, ওখানে দাঙ্গা, সেখানে চুরি রাহাজানি। দলে দলে মানুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানো। সেই গোলমালের মধ্যে ডাকাতি হল সেবাদের বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত্রি। সেবার বাবা বাড়ি ছিলেন না। বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন অন্য গ্রামে। বড়লোকের বিয়ে। পাড়ার পুরুষ ছেলে প্রায় সবাই গেছে বরের সঙ্গে। কেউ কোন রকম আশঙ্কা করে নি। তাদের ও-অঞ্চলটা চিরদিনই শান্ত। দু-একটা সিঁদেল চোর ধরে হৈ-চৈ করা ছাড়া পাড়ার লোকে আর বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পায় না।

ঠাকুরমার সঙ্গে পূবের ছোট ঘরখানায় শুয়ে ছিল সেবা। কারণ ওই ঘরেই ধানের গোলা। যা চুরির হিড়িক; ঠাকুরমার একার ভরসায় তা রাখা যায় না। তা ছাড়া তাঁর আবার বোবায়-ধরা রোগও আছে। একা থাকতে তাঁর ভাল লাগে না। আসলে একা থাকতে তাঁর ভয় করে। চোরের ভয় নয়, ভূতের ভয়।

অনেক রাত্রে গোঁ-গোঁ শব্দে সেবার যখন ঘুম ভাঙল সে ভাবল, ঠাকুরমাকে অন্য দিনের মত বোবায় পেয়েছে। কিন্তু ভাল করে চোখ মেলে দেখল, ঘর-ভরা আলো। তারপর দেখল, আলো নয়, মশালের আগুন। তারপর আর কিছু দেখতে পেল না। কারণ মুখোশ-পরা জন কয়েক দৈত্য ততক্ষণে তার চোখ মুখ হাত পা সব বেঁধে ফেলেছে।

কাহিনীর এই পর্বে এসে সেবা থামল। বীথিকা রুদ্ধশ্বাসে সব শুনছিল। সে বলল, 'সেবা, চুপ করলি কেন, তারপর কি হল বল্?'

সেবা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বীথিদি, তারপর আর বলে কি হবে! তার পরের বিবরণ খবরের কাগজের কাটিংগুলোতে আছে। তার চেয়েও বেশী আছে ফৌজদারী আদালতের নথিপত্রে। বাবার কাছে তার নকল রয়েছে। যদি দেখতে চাও চেয়ে পাঠাব।'

বীথিকা বলল, 'তুই যদি না বলতে চাস, আমি জোর করব না। শুধু একটা কথা। তার মধ্যে আতিকর ছিল?'

'ছিল বইকি।'

'তুই কি তাকে দেখে অবাক হয়েছিলি?'

'অবাক হওয়া উচিত ছিল না। তবু হয়েছিলাম।'

বীথিকা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আতিকর এখন কোথায়?'

সেবা বলল, 'তুমি কি কিছুই জান না? সে এখন জেলে। তবে সে একা নয়, আর দু জন তার সঙ্গে আছে। আর তিন জন পালিয়েছিল। পুলিস তাদের এখনও ধরতে পারে নি। তারা ফেরার হয়েই আছে।'

বীথিকা বলল, 'ধরা পড়ল কি করে?'

'গোপনে মূল আসামীই সবাইকে ধরিয়ে দিয়েছিল।'

বীথিকা জিজ্ঞাসা করল, 'দলের সঙ্গে এমন বেইমানি সে কেন করল?'

সেবা বলল, 'ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল। ভেবেছিল লুটের মাল সে একাই পাবে। কিন্তু সবাই ভাগ মিল।'

বীথিকা এবার শিউরে উঠে ওর মুখ চেপে ধরল। অস্ফুটস্বরে বললে, 'সেবা, থাক্, আর না, শুনতে চাই নে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে। ঘর তো নয়, যেন অন্ধকারের অতল সমুদ্র। সেই সমুদ্রগহ্বরে তলিয়ে আছে এ যুগের দুই তরুণী। যাদের বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রেম নেই, প্রীতি নেই—যারা পরম নেতিবাদিনী।

তারপর ফের কথা বলল বীথিকা: 'কিন্তু সেবা, সবচেয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার তো বাইরে নয়, ভিতরে। নিজের মনের গহ্বরে। সেখানে তো তোর কোন আঁধার নেই, তুই তো সেদিক থেকে নিষ্কলুষ। তবে আর তোর দুঃখ কিসের?'

সেবা কোনও জবাব দিল না। শ্রান্ত হয়ে এতক্ষণে বোধ হয় ও ঘুমিয়ে পড়েছে। বীথিকা আস্তে আস্তে ওর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন ক্ষণমাত্র পূর্বে এক দুর্বল অসহায়া কিশোরী ধর্ষিতা হয়েছে। তারই পরিচর্যার ভার নিয়েছে বীথিকা।

সেবা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু বীথিকার চোখে ঘুম এল না। কিছুক্ষণ বাদে সে আস্তে আস্তে ছাদে উঠে এল। বাইরে লুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা নগরী। এখনও তার গলায় রত্নহার, বিদ্যুতের মালা। আর দূরে পশ্চিম আকশে এক চিলতে চাঁদ। অবিশ্বাসী বহুবল্লভ বিজয়ী প্রণয়ীর ঠোঁটে শাণিত বিদ্রূপের রেখা।

৯

শৈলেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যার কাছে আর হার মানবেন না। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ—সেই মধুর পরাজয়ের আনন্দ-লাভের ভাগ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। আত্মীয়ের সঙ্গে, আত্মজের সঙ্গে তাঁর নিত্যসংগ্রাম। কিন্তু এই সংগ্রাম তো তিনি চান নি।

প্রথম যৌবনে কী চেয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ? যশ নয়, মান নয়, প্রতিপত্তি নয়, একান্তভাবে স্ত্রীকেই কাছে পেতে চেয়েছিলেন তিনি। 'ভার্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।' তাঁর কাছে মনোরমার অর্থ নয়নহরা নয়, শুধু মনোহরা। মনোহরণ করবে সেই নারী, যে তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুসারিণী হবে। সে তো শুধু দেহিনী নয়, সে যে মানসী। সেই মানসরূপই তো তার প্রকৃত রূপ। জরায় সে রূপের ক্ষয় নেই, রোগে বৈকল্য নেই, ভোগে বিতৃষ্ণা নেই।

তাই তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কিশোরী স্ত্রীকে। আর তাঁর মন শিক্ষিত বিদগ্ধ উদার নাগরিকের মন। এ তাঁর দম্ভের কথা নয়। স্বজন বন্ধু সহকর্মী মহলে তাঁর পরিমার্জিত রুচি শ্রদ্ধা পায়, তাঁর শান্ত সৌম্য প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব প্রীতি আর অনুরাগ অর্জন করে। তবু সেই মন নিয়ে একটি নারীর মনকে ছুঁতে পারলেন না তিনি। শৈলেন্দ্র কি নীরস?—জীবনে কতবার তিনি নিজেকে এ প্রশ্ন করেছেন। জ্ঞানসাহিত্য যত পড়েছেন, সংখ্যায় পরিমাণে রসসাহিত্য তার চেয়ে অনেক বেশী। রসাশ্রিত যে জ্ঞান তার দিকেই তাঁর আকর্ষণ। কিন্তু সেই রসবোধ নিয়ে আর একটি মনের রসসিন্ধুর নীরে তো ভাল, তীরে গিয়েও পৌছতে পারলেন না তিনি।

অবশ্য যে রসের মধ্যে মাদকতা বেশী, যে রঙের মধ্যে বর্ণাঢ্যতা প্রচুর,

জীবনযাত্রার যে ছন্দ উচ্ছলতার নামে ছুটি পা'কে উচ্ছৃঙ্খলতার শিকলে বাঁধে, সেই রূপ-রস-ছন্দের জগৎ তাঁর মনঃপূত নয়। তাঁর পৃথিবী নীতির পৃথিবী; নিয়মের পৃথিবী। অন্তর্জগৎ হোক আর বহির্জগৎই হোক, সেই একই সুরে একই নিয়মে বাঁধা। এই নীতি তার কাছেই বাধা যে এর স্বরূপ জানল না। ছন্দে হাত যার অপক্ক, জীবনকাব্যরচনায় সেই নীতির ছন্দকে সংযমের মিলকে অনাবশ্যক অন্তরায় বলে ভাবে। আর যে জানল, নীতিকে যে প্রীতির বাঁধনে বাঁধতে পারল, সে জীবন আর জগৎকে সাজাল একই শ্লোকের ছুটি পংক্তির মত। নীতি তার কাছে রুক্ষকঠোরা শিক্ষিকা নয়, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী। যার পায়ে কখনও আলতা কখনও নূপুর, যার কপালে কখনও সিঁদুর কখনও কুঙ্কুম, যে 'গৃহিণী সচিবা সখী প্রিয়া শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'।

কিন্তু স্ত্রীকে তো তেমন করে কাছে পেলেন না শৈলেন্দ্রনাথ। সে ভয় পেল। তার কাছে স্বামীর রূপ এক নীরস দারুমূর্তি হয়ে দেখা দিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রীতিতে প্রেমে সে মূর্তির মধ্যে নীরজা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নিতে পারল না।

তারপর এল ছেলে জয়ন্ত। নামটি নিজেই রেখেছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ। ভেবেছিলেন সে জয় করে নেবে স্বামী-স্ত্রীর অশ্রদ্ধা-অপ্রেমকে। সে দুজনের মধ্যে সেতু বাঁধবে। কিন্তু তা হল না। বরং দুজনের মধ্যে ব্যবধানকে সে বাড়িয়ে তুলল। তাকে নিয়েই মনোমালিন্য আর ঝগড়া-ঝাঁটির সৃষ্টি হল বেশী। নীরজা তাকে যে ভাবে খাওয়াতে চান, পরাতে চান, যে ধরনের চালচলনে অভ্যস্ত করাতে চান শৈলেন্দ্র তা চান না। আর এই চাওয়া না-চাওয়ার নিরন্তর টানা-পোড়েনে জয়ন্ত এগিয়ে গেল মার দিকে। কেন যাবে না? স্বামীকে যা দিতে পারেন নি, ছেলেকে তা দিলেন। স্নেহে বাৎসল্যে প্রশ্রয়ে সৌখ্যে উজাড় করে দিলেন নিজেকে। শুধু যে তাকে জয় করে নিলেন তা নয়। স্বামীর মনে ছেলের সম্বন্ধে ঈর্ষার উদ্রেক করবার চেষ্টা করলেন। হয়তো সজ্ঞানে নয়, সচেতনভাবে নয়। কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ ছেলের সঙ্গে তিনি কলেজে-পড়া তরুণীর মতই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। থিয়েটার-সিনেমায়, পার্কে ময়দানে; পর্বতে সমুদ্রতীরে বেড়ালেন তিনি।

জয়ন্ত শুধু শৈলেন্দ্রের আত্মজ। কিন্তু নীরজার মানস-পুত্র। পুত্রের মধ্যে এই মানসপুত্রকে শৈলেন্দ্র নিজেও তো চেয়েছিলেন। তেমন করে না পেলে কি পাওয়া হয়! শুধু রক্তে-মাংসে-গড়া পুত্র পেয়ে নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচতে পারে, পুরুষের পিতৃত্বের ক্ষুধা মেটে না।

সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জটিল। কিন্তু শৈলেন্দ্রনাথের মনে হয় পিতা-পুত্রের সম্পর্ক জটিলতর। ছেলের মধ্যে বাপ একই সঙ্গে নিজের প্রোটো-টাইপকে, নিজের অনুবৃত্তি পুনরাবৃত্তিকে দেখতে চায়, আবার বিদ্রোহে বিপ্লবের উদ্ধত বৈরিতায় ছেলের মধ্যে নিজের নবজন্ম নবজীবন নবযৌবন দেখতেও ইচ্ছা জাগে। পণ্ডিতের ছেলে মূর্খ, নীতিবিদের ছেলে অসংযত উচ্ছৃঙ্খল, বীরের ছেলে ভীরু কাপুরুষ এই জন্যেই হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সজ্ঞানে হোক অচেতন ভাবে হোক, বাপের কাছে থেকে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই ছেলে সম্পূর্ণ আর এক রকমের হয়ে ওঠে। এ বাপেরই গোপন মনের ভিন্ন রকমের হওয়ার সাধ, অন্যতর জন্মগ্রহণের সাধ। কখনও কঠোর শাসনে, কখনও শিথিল প্রশ্রয়ে সেই সাধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সচেতন মনের সমস্ত সাধনা ধূলিসাৎ হয়। আর অন্য দিকে ছেলে আপন বিদ্রোহে মুহূর্তে মুহূর্তে তার পিতৃমূর্তিকে ভেঙে খান খান করবে। সে বাপের বিত্ত নেবে, সম্পত্তি নেবে, কিন্তু স্বভাব আর জীবিকাকে কখনও নয়, কখনও নয়। তাতে পুনরাবৃত্তি, তাতে পুরনো গন্ধ। নিজের মনোলোকের এই বিশ্লেষণে নিজেই চমকে উঠেন শৈলেন্দ্রনাথ। সত্যিই কি তাই? তিনি কি নিজের ছেলের ওই পরিণতি চেয়েছিলেন? তিনি কি নিজের পুত্রকেই শত্রু কল্পনা করে তার পরাভব কামনা করেছিলেন? তাকে পর্যুদস্ত বিনষ্ট দেখতে চেয়েছিলেন? অনেক মহৎ শিল্পী যেমন তাঁর কাব্যে উপন্যাসে পাপের ছবি আঁকেন, তার সঙ্গে একাত্ম হন, তাকে চরম দণ্ড দেন, আবার তার জন্য অশ্রুপাতও করেন। এও কি সেই রকম?

নিজের ওপর এবার নিজেরই বিরক্তি ধরে যায় শৈলেন্দ্রনাথের। বড় বিশ্রী এই একা একা থাকা। যে নিজের মন নিয়ে নির্জনে থাকে, তার মনের মধ্যে এলোমেলো সহস্র জনের পদধ্বনি শোনা যায়। শৈলেন্দ্রনাথের মন

তো তাঁর একার নয়। স্বপক্ষের বিপক্ষের কত যুগের কত
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ববিদের মনঃসার দিয়ে তাঁর নিজের মন গড়া
বলে তিনি গোঁড়া, রক্ষণশীল, শুচিবায়ুগ্রস্ত? জীবনের যে ব্যাখ্যা
মনঃপূত নয়, তাকেও তিনি সযত্নে অধ্যয়ন করেছেন। সাধ্যমত জানতে
চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। পরধর্মকে ভয়াবহ বলে দূরে সরিয়ে রাখেন
নি। তা হলে বিচার করবেন কি করে? উত্তরপক্ষের জন্যই পূর্বপক্ষ
দরকার। বাম হাত না থাকলে শুধু দক্ষিণ হাত ক্ষীণবল, কখনও বা দৃঢ়তায়
প্রবল। বিশেষ করে রাষ্ট্রনীতিতে। ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে শিল্পে প্রতিপক্ষ
রুচিকে ভয় করেন না শৈলেন্দ্রনাথ, তাকে অবজ্ঞাও করেন না। তাকে
স্বীকার করেই তার সঙ্গে সংগ্রাম করেন।

কিন্তু আর না। নিজের চিন্তার ভারে এবার তিনি ভারাক্রান্ত।

'সেবা! সেবা!'

সেবা এসে দাঁড়াল তাঁর টেবিলের সামনে। বলল, 'ডাকছেন
বড়মামা?'

'হ্যাঁ। তোমার হাতে সাদা সাদা ও কি?'

সেবা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'রুক্মিণীর সঙ্গে ময়দা মাখছিলাম।
আপনি ডাকলেন বলে তাড়াতাড়ি হাত না ধুয়েই চলে এলাম। কিন্তু
আপিস থেকে ফিরে এসে চুপচাপ এমন করে বসে আছেন কেন? যান না,
লেকের ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসুন না। ভাল লাগবে।'

এমন স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠ শৈলেন্দ্রনাথ জীবনে অনেক দিন শোনেন নি। সেই
ধ্বনিটুকুর স্বাদ শ্রবণে মনে মেখে নিতে নিতে তিনি আবার জিজ্ঞাসা
করলেন, 'ভাল লাগবে? জান সেবা, বড় ভাল লাগছে তোমার ওই ময়দা-
মাখা হাত, অনেক দিন পরে দেখলাম ঘরের কাজের এই সরল শুভ্র রূপ।
ওরা কোথায়—তোমার মামী আর বীথিদি?'

'ঘরেই ছিলেন। একটু আগে আনন্দবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন?'

'আনন্দবাবুটি আবার কে? তাঁর নাম তো এর আগে শুনি নি।'

সেবা হেসে বলল, 'কি আশ্চর্য! শহরে সবাই যে আনন্দময় নন্দীর নাম

নাম-করা অভিনেতা! এবার থেকে ডিরেকশনও দেবেন। নতুন ছবিতে বীথিদির একটা কনট্রাক্ট হওয়ার কথা আছে। সেই জন্যেই বোধ হয় গেছেন ধর্মতলায় প্রডিউসারের আপিসে।'

শৈলেন্দ্রনাথ বলেন, 'ও। আর তোমার মামী? তিনি বুঝি বেড়াতে বেড়িয়েছেন?'

'বাঃ, বেড়াতে বেরুবেন কেন! তিনিও তো কাজেই গেছেন বড়মামা।'

'কাজ! তার আবার কি কাজ?'

'যোগেশ্বরবাবু মানে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে তিনি যে কমার্শিয়াল কলেজ খুলেছেন হাজরা রোডের ওপর। সেখানে গেছেন। ছেলেদের মত অনেক ভদ্রঘরের বউ আর মেয়েরা সেখানে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শেখে। মামীমা গার্লস সেকশনের ইনচার্জ। চমৎকার কলেজ হয়েছে বড়মামা। মেসোমশাই পুরনো কলেজটাকে ঢেলে একেবারে নতুন করে সাজিয়েছেন। দামী দামী সব ফার্নিচার, পর্দা, ছোট সুন্দর সুন্দর চেম্বার। কতকটা বীথিদিদের থিয়েটারের যে আপিস সেই রকম করে সাজানো।'

শৈলেন্দ্রনাথ হঠাৎ অধীর হয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি গিয়েছিলে নাকি সেখানে?'

সেবা স্বীকার করে বলল, 'গিয়েছিলাম। ভেবেছি আমিও ও-মাস থেকে ভর্তি হয়ে যাব। টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিতে পারলে শুনেছি চাকরি-বাকরির সুবিধে হয়। এমনিতে কত জায়গায় তো অ্যাপ্লাই করলাম। কোন জবাবই এল না।'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'খবরদার, ওই টাইপের ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে না। আমি তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে দোব। আমাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব তোমাকে।'

সেবা বলল, 'তা হলে তো ভালই হয়। কিন্তু আমার মত অল্পবিদ্যায় সেখানকার চাকরি কি হবে?'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি চেষ্টা করব তোমার জন্যে। তোমার যোগ্য কাজ যাতে হয় তার জন্যে লাইব্রেরিয়ানকে বলব। আমি কারও জন্যে কিছু

বলি নে। কিন্তু তোমার জন্যে বলব সেবা।
হতে দেব না।' সেবা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করল

একটু বাদে শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'যাও, শাড়ি.
আমার সঙ্গে লেক থেকে বেরিয়ে আসবে।'

সেবা একটু বিস্মিত হল। তার পরে হেসে বলল, 'আচ্ছা .

শুধু ভারি ভারি তত্ত্বকথা নয়, জটিল গুরুতর উপদেশ নয়, সেবাে
টানতে হলে আর একটু লঘু হতে হবে শৈলেন্দ্রনাথকে। ওর সঙ্গে ে
হবে, ওকে নিয়ে বেড়াতে হবে। কয়েকটি বাছা বাছা সৎপরিবারে
সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। না হলে বিপরীত দিকের প্রবল
আকর্ষণ থেকে কিছুতেই তিনি ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। যেমন
করে জয়ন্তকে হারিয়েছেন, তেমনি করে ওকেও হারাতে হবে।

গোড়ার দিকে বীথি তো তাঁকেই ভালবাসত, তাঁর কাছে থাকত। একটু
বকলে অভিমানে ঠোঁট ফুলাত, আদর করলে গলা জড়িয়ে ধরত। শৈলেন্দ্র-
নাথ বড় আশা করেছিলেন, অন্তত মেয়ে তাঁর হবে। মেয়ে তো বাপেরই
সোহাগী হয়। হোক মেয়ে। তাকেও যদি মানুষ করে তুলতে পারেন তা
হলে ঢের কাজ হবে। শতপুত্রসম কন্যা। মেয়ে তাঁর আশা মেটাবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও হিসেবে গোলমাল হল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত
তার ওপর পড়া শুনার চাপ দিতে লাগলেন, তার মনে দায়িত্ববোধ কর্তব্য-
বোধ জন্মাবার চেষ্টা করতে গেলেন, ততই সে দূরে সরে গেল। তার
সাজসজ্জা পোশাকপরিচ্ছদের যত সমালোচনা করলেন, ততই সে বিরূপ
হয়ে উঠল। তারপর আরও বড় হয়ে সেও মার মতই আবিষ্কার করল,
বাপের মধ্যে রস বলে কোন পদার্থ নেই। তিনি কাঠ আর লোহার মত
কেবল শক্ত শক্ত শব্দ আর তার দুরূহ অর্থ দিয়ে তৈরি। তিনি মেয়েকে
যৌবনে-যোগিনী আর তপস্বিনী সাজাতে চান। পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে
মনস্বিনী করে তুলবেন—এই যেন তাঁর পণ। মনের আর কোন সাধ
আহ্লাদের দিকে তিনি তাকাবেন না: বীথিও তাঁকে ভুল বুঝল। সৎ
চরিত্রবান ছেলে দেখে বিয়ে দিলেন। বীথি তাঁর মধ্যে বাপেরই প্রতিমূর্তি

‿ঙল। তারপর সংসার সমাজ সব ভেঙে

।

এই ভুল করেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতেই শাসনের

রছিলেন। নিজের রুচি আর আদর্শনিষ্ঠার চাপ বেশী

ওপর। কিন্তু মানুষ তো আর বৈজ্ঞানিক হয়ে তুলাদণ্ড হাতে

ারেটরিতে বসে নেই। এখানে মাত্রাধিক্য তো ঘটবেই। স্ত্রী ছেলেমেয়ে তো পরীক্ষাগারের গিনিপিগ নয় যে, নিত্য-নতুন এক্স-ারিমেণ্ট চালাবেন তাদের ওপর। তিনি তা চান নি। তিনি স্বামী হিসাবে পিতা হিসাবে নিজের মত বুদ্ধি আদর্শ অনুযায়ী পরম মমতায় নিজের সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যদি অদৃষ্টবাদী হতেন, অদৃষ্টের দোষ দিতেন। কিন্তু তা তো পারবেন না। তাই যে দোষ সহজে দৃষ্ট হয় না, যা বীজাণুর মত চতুর্দিকে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে কিংবা নিজের আচার-আচরণে বাক্যে চিন্তায় মিশে আছে, বৈজ্ঞানিকের চোখ নিয়ে তা বার বার অনুসন্ধান করেন। খোঁজ পেলে তার সংশোধনের চেষ্টা করেন শৈলেন্দ্রনাথ। সামাজিক ক্ষেত্রে কলমে, নিজের ক্ষেত্রে হাতেকলমে। কিন্তু এবার তাঁকে সহজ হতে হবে। নির্দোষ লঘু আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ধরা দিতে হবে। তার মধ্যে ধরে আনতে হবে সেবাকে। না হলে সেও আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এ যাওয়া তো শুধু শৈলেন্দ্রের হাতের বাইরে যাওয়া নয়, সততা সংযম নীতি নিষ্ঠার বাইরে চলে যাওয়া। সে যে কত অধোগমন তা কি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে না সেবা?

আশ্চর্য, নীরজা তা হলে তার ভগ্নীপতির সঙ্গে পার্টনারশিপে সত্যিই ব্যবসায়ে নামল! কয়েক দিন আগে সে এসে কথাটা পেড়েছিল বটে। লোক-দেখানো ভাবে স্বামীর মত নিতে এসেছিল—'জামাইবাবু তাঁর এক বন্ধুর কলেজ কিনে নিয়েছেন। আমাকে বলছেন তাঁর পার্টনার হয়ে কাজ করতে। ম্যানেজমেণ্টের দিকটাই অবশ্য দেখতে হবে। আজকাল এ ধরনের কলেজ বেশ প্রফিটেব্‌ল।'

শৈলেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সংসারে প্রফিটটাই কি সব ?'

নীরজা জবাব দিয়েছিলেন, 'অন্তত লসটা সব নয়। লস দেব ভেবে বিজনেস কেউ করেও না।'

বেশ, 'তোমার যা খুশি তাই কর।'

নীরজা বলেছিলেন, 'খুশিমত করবার আর কি আছে বল! ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে। তারা যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তুমিও তাই। তুমি যখন কাজ কর, কর, যখন কর না বসে বসে কেবল চিন্তা কর। সে জগতে আর কেউ ঢুকতে পারে না। সংসারের যেটুকু কাজ ছিল, সেবা এসে টেনে নিয়েছে। আমার সময়তো কাটা চাই।'

'বললাম তো তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।'

নীরজা তবু কৈফিয়তের সুরে বলেছিলেন, 'এতে জামাইবাবুর যদি কিছু উপকার হয় আর আমার সংসারেও কিছু আসে তাতে ক্ষতি কি! মেয়ে যে চিরকালই আমার সংসারে থাকবে এমন তো কোন কথা নেই। আর আমি তা চাইও নে। ছেলেও বিয়ে-থা করে আলাদা হয়ে যেতে পারে। আজকাল হয়ও তাই। আর তুমি তো আলাদা হয়েই আছ। আমার পথ আমাকেই দেখতে হবে। অনেক আগেই দেখা উচিত ছিল।'

শৈলেন্দ্রনাথ অপ্রসন্ন মুখে বলেছিলেন, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না। যা উচিত মনে কর করবে। আমি তো আমার কথা বলেই দিয়েছি।'

নিজের অনিচ্ছা আর অসম্মতি গোপন রাখেন নি শৈলেন্দ্রনাথ। নীরজা ইচ্ছা করেই তা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু ওই যোগেশ্বর দত্তকে কি নীরজা নিজেই চেনে না? অর্থলোভে যোগেশ্বর না করতে পারে এমন কিছু নেই। কত ব্যবসার পত্তন করল, কত ব্যবসা ডুবিয়ে নিজের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াল, ভগ্নীপতির সে সব কীর্তির কথা শ্যালিকা যে কিছু না জানে তা নয়, তবু তাঁর নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস: তাঁকে কেউ ঠকাতে পারবে না। একটু বিপদ-আপদের ঝুঁকি না নিলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে হয়। তা ছাড়া পুরোপুরি মতের মিল, রুচির মিল এ সংসারে কার সঙ্গেই বা হয়ে থাকে! লাইফের পার্টনারের সঙ্গেই হয় না, আর তো ব্রীজের পার্টনার, বিজনেসের

পার্টনার! মিক্স মানেই গোঁজামিল। এই সহজ সত্যটাকে মেনে নিতে পারলে সংসারে অনেক ভুল-বোঝাবুঝির আশঙ্কা কমে।—এ ধরনের কথা স্ত্রীর মুখে মাঝে মাঝে শুনেছেন শৈলেন্দ্রনাথ। তাই ও-পক্ষের চিন্তার ধারা অনুসরণ করতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

'বড়মামা, এখন যাবেন?'—সেবা বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে ঘরে ঢুকল: 'এ কি, আপনি তখন থেকে অন্ধকারেই বসে আছেন! রুক্মিণী হরিদাস ওরা যেন কী! কোন যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! আলোটা জেলে দেব?'

হঠাৎ শৈলেন্দ্রনাথ আবেগভরা গলায় বলে উঠলেন, 'দাও, দাও, 'আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো'।'

আলো জেলে দিয়ে সেবা আর টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে এল না। ঘরের মাঝখানে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি তার পরনে। কপালে একটি কুঙ্কুমবিন্দু। গলায় সরু হার। নীরজাই দিয়েছেন তাঁর এই পুরনো হারছড়া ব্যবহার করতে। গায়ে সাদা ব্লাউজের হাতায় হলুদ সুতোর এমব্রয়ডারি। চোখ জুড়িয়ে গেল শৈলেন্দ্রনাথের। বীথিকার সঙ্গে এক ঘরে বাস করলেও তার বেশবাসের অনুকরণ করে নি সেবা। শুধু ঠাট্টার চোটে ঠাকুরমার দেওয়া সেই তাবিজটি খুলে রেখেছে।

ওকে অমন অপ্রস্তুত হতে দেখে শৈলেন্দ্রনাথ নিজেও একটু অপ্রতিভ হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ভঙ্গিটুকু স্নেহের হাসিতে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এস।'

সেবা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন?'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'মনটা হঠাৎ বড় দুঃখে ভরে উঠেছিল সেবা। ছেলেবেলার মুখস্থ করা কবিতার লাইনটি বেরিয়ে পড়ল।'

সেবা বলল, 'কবিতাটি আমিও পড়েছি। 'নৈবেদ্য' বইখানা একবার প্রাইজ পেয়েছিলাম স্কুল থেকে। ওর পরের লাইনটি তো—'সব দুঃখ শোক

সার্থক হোক লভিয়া তোমারই আলো!'। ছোট দিদিমণি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, ভক্ত কবি ভগবানের উদ্দেশে—'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'তিনি নিশ্চয়ই তাই লিখেছিলেন। আমি ভগবানের উদ্দেশে বলি নি। কার উদ্দেশে বলেছি জানি নে। তবে এখনও গৃহদীপ জ্বালাবার জন্যে আমরা মেয়েদেরই ডাকি।'

সেবা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল। বড়মামার আজ হল কি! ভূতে বরং রামনাম করে, কিন্তু তিনি কোন মেয়ের নাম তো এ পর্যন্ত মুখে আনেন নি—বিশেষ করে তার মত স্নেহের পাত্রীর কাছে।

শৈলেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, গৃহদীপের সঙ্গে সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীর কথাটাই মনে আসে সেবা। যদিও শহরের ঘরে ঘরে সেই দীপ নেই, সেই তেল নেই, সেই সলতে নেই; তবু গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকাটি এখনও আছে। আমার ধারণা চিরকাল থাকবে। যদিও শুভেন্দুরা বলে—'

সেবার মনের এতদিনের শ্রদ্ধা আজ সমবেদনায় রূপ পেল। সে স্নিগ্ধ আবেগার্দ্রস্বরে বলল, 'ওদের কথা থাক। আপনি যা বলছিলেন বলুন।'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি ব্যক্তিগত জীবনে পেলাম না বলে এর সমষ্টিগত অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি নে। গৃহলক্ষ্মীকে যারা স্ত্রীর মধ্যে পায় তারা ভাগ্যবান। যারা স্ত্রীর মধ্যে হারায় তারা দুর্ভাগা।'

সেবা চুপ করে রইল।

শৈলেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, 'কিন্তু শুধু স্ত্রীই বা কেন? সে মায়ের মধ্যে আসুক, বোনের মধ্যে আসুক, মেয়ের মধ্যে আসুক, বান্ধবীর মধ্যে আসুক। যে কোন রূপে যে কোন বেশে এলেই হল। কারও না কারও মধ্যে সেই অন্তর-লক্ষ্মীকে পেলেই হল। পাওয়াটাই বড় কথা সেবা।

এমন তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগের রূপ বড়মামার চোখে মুখে ভাষায় সে আর কোনদিন দেখে নি। সেবা বলল, 'অনেক যে রাত হল! আর কখন বেড়াতে যাবেন বড়মামা?'

একটু যেন চমকে উঠলেন শৈলেন্দ্রনাথ। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও হ্যাঁ, চল, এবার চল।'

তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, 'পাওয়াটাই বড় কথা সেবা। তবু সব পাওয়ার ধরন এক রকম নয়।, বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব—এ জীবন নানা মধুর সম্পর্কের সুতোয় জড়ানো। এই পৃথিবীর পথে পথে কত গিঁট কত বাঁধন! আর কী বিচিত্র এই সম্পর্কের স্বাদ! একই বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিন্তু ব্যক্তিভেদে তার স্বাদ আলাদা আলাদা। সম্পর্কের সেই রসবৈচিত্র্য যেন বজায় রাখতে পারি। যেন অতি লোভে, অতি তৃষ্ণায় সব একাকার করে তোলবার মত মতিচ্ছন্নতা আমার কোনদিন না আসে।'

সেবাকে নিয়ে লেকের পাড়ে এসে পৌঁছলেন শৈলেন্দ্রনাথ। নিজের মনে ভেবে চলেছেন। তারপর রাউণ্ড দিতে দিতে এক সময় বললেন, 'চাই বইকি, আমিও চাই। আমিও এই সংসারের কারও না কারও সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হয়ে মিশে যেতে চাই। মনে মনে বলি, কেউ না কেউ কাছে এস। মিত্ররূপে হোক, পুত্ররূপে হোক, জায়ারূপে হোক, জননীরূপে হোক আমাকে স্পর্শ কর, আমাকে সঙ্গ দাও। এই নিঃসঙ্গতাব ভার আমি আর সইতে পারি নে।'

দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন শৈলেন্দ্রনাথ। সেবা এসে পাশে বসল। কাছে বসল। শ্রদ্ধা আর ভয়েব ব্যবধান হঠাৎ যেন দূর হয়ে গেছে।

অল্প অল্প বাতাসে লেকের কালো জলে ঢেউ উঠেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ চণ্ডীপুরের সীমান্তে আর একটি জলাধারের কথা মনে পড়ে গেল সেবার। যে খাল এই শ্রাবণে আবার ভরে উঠেছে কিন্তু সেই জলের স্বচ্ছতা আর নেই। জামরুলগাছের ছায়া আর পড়ে না, গাছটাও নাকি উপরে পড়েছে।

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'কী ভাবছ সেবা?'

সেবা হঠাৎ মাথা নেড়ে পূর্বস্মৃতি যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইল। তারপর বলল, 'আপনার কথাগুলিই ভাবছিলাম। আপনি আমাকে সাহস দিয়েছেন তাই বলি। কিন্তু ভয় হয়, শেষে বাচালতা ভেবে রাগ না করেন।'

'না না, রাগ করব কেন, বল।'

সেবা বলল, 'একটু আগে আপনি মনে মনে চাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মনে মনে চাইলেই তো শুধু হয় না।'

'তবে কী করে চাইলে হয়?'—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন শৈলেন্দ্রনাথ। উনিশ-কুড়ি বছরের এই কন্যাসমা মেয়েটির কাছে থেকে তিনি যেন জীবনের শিক্ষা নিতে চাইছেন। এই মুহূর্তে তাঁর মনে কোন অভিমান নেই। তাঁর আবেগার্দ্র মন বার বার ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল। শিক্ষা নাও, শিক্ষা নাও, তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে শুধু প্রাণ-চাঞ্চল্যই আহরণ কোরো না, তাদের কাছ থেকে শিক্ষাও নাও। কে জানে জীবনের কোন্ পুরনো তত্ত্ব তাদের চোখে নতুন রূপ পেল! তাদের মুখে নতুন ভাষা পেল! কোন্ নতুন আশায় জীবনকে তারা মুকুলিত মঞ্জরিত করে তুলল! শুধু বয়োবৃদ্ধির অহঙ্কার কোরো না। বয়োবৃদ্ধ তো বটগাছও।

শৈলেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল, কি করে চাইলে হয়?'

সেবা এবার লজ্জিত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা আমি কি করে বলব বড়মামা? আপনি আমার চেয়ে কত বড়, কত পণ্ডিত, কত বিদ্বান—'

শৈলেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব কথা থাক। চাওয়ার ধরন সম্বন্ধে কি তোমার মনে হয়েছে তাই বল।'

সেবা বলল, 'আমার মনে হয়েছে—আমার মনে হয়েছে—শুধু মনে মনে চাইলেই হবে কেন বড়মামা? মানুষকে তো মনের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে ভুল না বোঝে তেমন ব্যবহার করতে হবে, আবার তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেও নিতে হবে। তবেই তো তাঁরা আপনার কাছে আসবেন, আপনি তাঁদের কাছে যেতে পারবেন। দূর মনে করলেই দূর, আবার কাছে মনে করলেই কাছে। আমার তো মনে হয় আমরা সবাই খুব কাছাকাছি আছি বড়মামা। কাছে থেকেই হিংসা করছি, ভালবাসছি, ন্যায় করছি, অন্যায় করছি। আমি তো কোন দূরত্ব দেখতে পাই নে।

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি সুখী সেবা। না কি তোমার বয়স অল্প বলে

তুমি অল্পেই তুষ্ট।' কাছে মনে করলেই কাছে, দূর মনে করলেই দূর। এ কি শুধু মনে করাকরির ব্যাপার?—নিজের মনকেই যেন প্রশ্ন করলেন শৈলেন্দ্রনাথ। সেবার কাছে জীবনের একটি জিজ্ঞাসার যে গভীর সদুত্তর আশা করেছিলেন তা যেন পেলেন না। তবে তাঁর জন্যে তেমন ক্ষুণ্ণও হলেন না। তাঁর প্রশ্নের জবাব দেবে তেমন সাধ্য কি ওর আছে! ওর কীই এমন বয়স, কীই বা বিদ্যাবুদ্ধি! তবে একটা কথা বোধ হয় ঠিকই বলেছে। মনের কথা মানুষকে জানানো দরকার। আর এই মনের কথা জানাবার জন্যেই তো যত শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী তো শুধু নিজের মনের কথা বলে না, সকলের মনের কথা সকলের কাছে পৌছে দেন। অবশ্য সকলের কথা বলব বলে কোমর বেঁধে বসলেই সকলের কথা বলা হয় না। নিজের কথা বলতে বলতেই তিনি সকলের কথা বলেন। এই আত্মীয়করণ না হলে তাঁর কথা অনাত্মীয়ের কথার মত শোনায়। কিন্তু শৈলেন্দ্রনাথের তো এই শিল্পের মাধ্যম নেই। তিনি গাইতে জানেন না, লিখতে জানেন না, ছবি আঁকতে জানেন না। শুধু তিনি কেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোকেই তা জানে না আর যারা জানে তারাই বা কতটুকু জানে! তবু তো তাদের দম্ভের সীমা নেই। সাধারণ শিল্পীরা শুধু দম্ভে অসাধারণ। যাদের শিল্পের মাধ্যম নেই তাদের কী আছে? তাদের মনের ভাষা প্রকাশের জন্যে আছে কাজ, কল্যাণকর্ম—জীবন যে কোন শিল্পের চেয়ে বৃহত্তর—বৃহত্তম মাধ্যম। কিন্তু এ মাধ্যম আয়ত্ত করা সহজ নয়। কল্যাণকর্মী হওয়া সহজ। যে কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে কি রাজনৈতিক দলে গিয়ে নাম লেখালেই হল। কিন্তু কল্যাণ শিল্পী হওয়া বড় কঠিন। সে কাঠিন্য নিজের জীবনে, সংকীর্ণ গণ্ডির পারিবারিক জীবনেও প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন শৈলেন্দ্রনাথ।

আশেপাশের বায়ুসেবীরা মাঝে মাঝে সেবাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আর নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলিও করছিল। ভাবভঙ্গিতে তাদের মনের কথা আন্দাজ করে সেবা আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। বড়মামা বাবার বয়সী হলেও, এমন কি বয়সে দু-এক বছরের বড় হলেও বাবার মত

বেঁটে টেকোমাথা ভুঁড়িওয়ালা ভারি-ভক্ত মানুষ নন। ওঁর মন যত চিন্তা-ভারাক্রান্তই হোক, দেহের যেন কোন ভার নেই। পাতলা ছিপছিপে প্রায় ছ ফুট লম্বা শরীর। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। লম্বা টানা টানা নাক চোখ, চাপা পাতলা ঠোঁট, মাথার পাকা চুল এখনও অতি কষ্টে বেছে বার করতে হয়। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরোলে এখনও চল্লিশের নীচে মনে হয় তাঁর বয়স। বড়মামা কোনদিন মিথ্যে কথা বলেন না। কোন কিছু গোপন করেন না, কিন্তু নিজের চেহারার তারুণ্যে আসল বয়সটিকে বেশ ঢেকে রেখেছেন। সেবা শুনেছে, বীথিদিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন অচেনা লোক তাকে বীথিদিদির দাদা বলে ভাবত। কেউ কেউ অন্য কিছু বলে ভেবেও ভুল করত। শুভেন্দুবাবু একবার বলেছিলেন, বীথি তার বাপকে পুরোপুরি বশে আনতে না পেরেই অমন করে বিগড়ে গেছে আর জয়ন্ত নিজের অজ্ঞাতে ওর মার দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে থেমে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বোতল ধরেছে। নইলে ওর মদ ছোঁবার কোন কারণ নেই।

ছি ছি ছি, এসব কথা শুনলে গা-ঘিনঘিন করে। শুভেন্দুবাবুকে সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাকে সে ঘৃণা করে। অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, শুভেন্দুবাবু কত নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কথাগুলি বলে যান! কখনও বৈজ্ঞানিকের মত কখনও বা ব্যঙ্গরসিকের মত। তাঁর সাহস দেখে অবাক হয়ে যায় সেবা।

চার দিকে সব খালি হয়ে গেছে। অনেক সুবেশ সুসজ্জিত ছেলেমেয়ে এতক্ষণ ধরে পাশাপাশি কাছাকাছি মুখোমুখি বসে মনের আনন্দে গল্প করেছে। তারপর এক সময় উঠে চলে গেছে। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ কেউ গাড়িতে।

সেবা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'বড়মামা, অনেক রাত হয়ে গেল যে।'

হাতঘড়িটা একেবারে চোখের কাছে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন শৈলেন্দ্রনাথ। নিজেও বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাই তো, এত রাত হয়ে গেছে! চল, এবার ওঠা যাক।'

খানিক দূর এগোতেই একজন রিক্‌শাওয়ালাকে দেখা গেল। অপ্রসন্ন মুখে খালি রিক্‌শাটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। বোধ হয় সারাদিনে আশানুরূপ রোজগার হয় নি। দেখে শৈলেন্দ্রনাথের করুণা হল। হাতের ইশারায় তিনি তাকে ডেকে নিলেন। তারপর সেবার দিকে চেয়ে বললেন, 'উঠে বস।'

সেবা সভয়ে বলল, 'কিন্তু রিক্‌শায় গেলে যে আরও দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে ট্রাম বাসে—'

এবার শৈলেন্দ্রনাথ ধমক দিয়ে উঠলেন, 'দেরি হয়ে গেলে কি হবে তুমি তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছ।'

লজ্জিত হয়ে সেবা রিক্‌শার একদিকে উঠে বসল।

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'কিছু ফুল কিনে নিয়ে গেলে হত।'

সেবা বলল, 'এত রাত্রে ফুল পাবেন কোথায়?'

মোড়ের ফলের দোকানটা তখনও বন্ধ হয় নি। শৈলেন্দ্রনাথ রিক্‌শা থামিয়ে হঠাৎ এক ডজন বড় বড় আপেল কিনে ফেললেন। বললেন, 'আপেল ওরা ভালবাসে।' ঠোঙাটা দিলেন সেবাব হাতে।

সুগোল জমাট রক্তের মত বর্ণের বড় বড় ফল। ওদেব মধ্যে কিছুটা ফুলের সৌন্দর্যও যেন মিশে রয়েছে।

বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌছতেই দেখেন, নীবজা একেবারে সপরিবারে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বয়েছেন। সারা মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ। বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

শৈলেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

নীরজা বললেন, 'আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'কি আশ্চর্য, এই তো লেকের ধারেই বসেছিলাম। চল, ঘরে চল।'

কিন্তু ঘরে গিয়েও নীরজা শান্ত হলেন না। সেবা ভয়ে ভয়ে ফলের ঠোঙাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ফলগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। গড়িয়ে বেড়াতে লাগল বলের মত।

শৈলেন্দ্রনাথ মনের রাগ সাধ্যমত চেপে রেখে বললেন, 'ও কি হচ্ছে?'

নীরজা বললেন, 'আমি লাহিড়ীদের ওখানে, চ্যাটার্জিদের ওখানে, ডক্টর সেনগুপ্তের বাড়িতে সব জায়গায় ফোন করেছি। কোথাও তোমাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন,'এত খোঁজাখুঁজির কি হয়েছে আমি তো বুঝি নে।'

নীরজা বললেন, 'সে বোধ কি তোমার আছে যে বুঝবে? এতক্ষণ লেকের ধারেই ছিলে?'

শৈলেন্দ্রনাথ বললেন, 'বললামই তো!'

নীরজা বললেন, 'হরিদাস তো ওদিকে গিয়েও খুঁজে এল। পাড়ে ছিলে, না, জলে নেমেছিলে?'

শৈলেন্দ্রনাথের আর সহ্য হল না। হঠাৎ এগিয়ে এসে স্ত্রীর গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

সেবা এতক্ষণ বাইরে ছিল, এবার ঘরে এসে আর্তনাদের স্বরে বলল, 'বড়মামা!'

বীথি আর জয়ন্তও যার যার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে এগিয়ে এল।

শৈলেন্দ্র তখনও রাগে কাঁপছেন।

জয়ন্ত এবার ঘরে ঢুকল। ওর মুখে মদের গন্ধ। পা একটু একটু টলছে। কিন্তু তাই বলে কর্তব্যে ত্রুটি হল না। রাগ করে নয়, সস্নেহে সাদরে ক্রোধোন্মত্ত বাপকে জড়িয়ে ধরে প্রমত্ত ছেলে তাঁকে নিজের ঘরে পৌঁছে দিল।

১০

সেবা ভেবেছিল, এত কাণ্ডের পরে সে আর মামীমাকে মুখ দেখাতে পারবে না। নিজের কোন অপরাধের জন্য নয়, অপরাধিনী মামীমাব মুখেব দিকেই তাকাতে তার লজ্জা করবে। তিনি নিজেও লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে থাকবেন। সেবা স্থির করল নাবকেলডাঙায় তার এক গরিব পিসীর বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবে। পিসেমশাই আব পিসীমা বুড়ো বুড়ী দুজনে থাকেন। তাঁদের সংসারে কোন ঝামেলা নেই। ইতিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করে এসেছে সেবা। কিছুদিন সেখানে থেকে একটা চাকরি-বাকরি কিছু জুটলে মেয়েদেব কোন হস্টেল কি বোর্ডিংয়ে চলে যাবে।

না বলে যাওয়া যায় না। তাই কথাটা বলবাব জন্যেই পবদিন সকালবেলা সে মামীমার ঘরে এল।

নীরজা চা খেতে খেতে তাঁদেব কমার্শিয়াল কলেজের একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। সেবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপাব ?'

সেবা যা ভেবেছিল তা নয়, সে ভেবেছিল ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামীর হাতে লাঞ্ছিতা লজ্জিতা একটি নাবীর মুখই বুঝি সে দেখতে পাবে। কিন্তু এসে দেখল পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন এক সম্রাজ্ঞী। মুখখানা গম্ভীর, চেহারা রাশভারী। তিনি বললেন, 'কি ব্যাপাব সেবা!'—শুধু বলা নয়, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দুটি চোখ তার দিকে তুলে ধরলেন নীবজা।

সেবা আমতা আমতা করে বলল, 'মামীমা, আমি দিনকয়েকের জন্যে নারকেলডাঙায় আমার পিসীমার কাছে যেতে চাই।'

নীরজা বললেন, 'নারকেলডাঙায়! ওই খোলা ড্রেন আর মশার রাজত্বে! না সেবা, আমি সেখানে তোমাকে যেতে দিতে পারি নে। শেষে ম্যালেরিয়া-

ট্যালেরিয়ায় এসে ধরবে। আর ঠাকুরঝির কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমার প্রাণ যাবে।'—নীরজা এবার একটু হাসলেন।

সেবা বলল, 'কিন্তু মামীমা, আপনার এত অশান্তি—'

আমার অশান্তি!—'আমার' কথাটার ওপর বিশেষ এক ঝোঁক দিয়ে এবং 'অশান্তি' শব্দটির শেষে বিস্ময়-বিরক্তি-ক্রোধের এক মিশ্রিত অনুরণন তুলে সেবার দিকে চেয়ে রইলেন নীরজা। চোখে তাঁর প্রখর জ্বলন্ত দৃষ্টি।

মনে হল একটু আগে পিস্তলের একটি গুলি সেবার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছেন মামীমা। তার শব্দ থেমে গেছে, কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনও নেবে নি। তারপর পলক ফেলতে না ফেলতে সে আগুনও নিবল। মুখে হাসি, কণ্ঠে স্নিগ্ধতা নিয়ে এলেন নীরজা। তারপর ফের সেই কথাটিই বললেন, 'অশান্তি!'

ওই একই শব্দ। কিন্তু উচ্চারণের ভঙ্গিতে অন্য ধ্বনি আর অন্য অর্থ ব্যঞ্জিত হল। এবার প্রশান্ত উদার বৈরাগ্যে নীরজা বললেন, 'অশান্তি কোন্ সংসারে নেই সেবা? বোকা মেয়ে, তুমি সেই ভয়ে এখান থেকে পালাতে চাইছ! পালিয়ে যাবে কোথায়? মঠে? আশ্রমে? সেখানেও এই। নইলে আমি কবে চলে যেতাম।'

এবার গলাটা আর অভিনেত্রীর মত শোনাল না। এবার যেন সত্যিই এক সংসারবিরাগিণী উদাসিনী নারী নীরজার ভিতর থেকে কথা বলে উঠল।

সেবার বুকে এবার আর গুলি নয়, অন্য কিছু গিয়ে বিঁধল। তাকে কি বলবে সে? তীর? না, সমবেদনার ও-ধরনের কোন উপমা নেই। তা তীরের মত নয়, গুলির মত নয়, তা অপরিমেয় এক বাষ্পপুঞ্জের মত, যা সমস্ত মনকে হৃদয়কে সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, যার অল্প কিছু শুধু দুই চোখে জল হয়ে জমে ওঠে।

সেবা বলল, 'আপনি যাবেন কেন মামীমা! আমিই বরং—। সত্যি, বড়মামা—'

নীরজা এবার পরম বাৎসল্যে হাসলেন: 'তোমার বড়মামার কথা আর বোলো না। সেবার যোগেশ্বর দত্ত আমাকে একটা মজার বই পড়তে

দিয়েছিল। তাতে ছিল **Poets are mad, Philosophers eccentric**—কথাটার মধ্যে একটু হয়তো বাড়াবাড়ি আছে। বাড়াবাড়ি না থাকলে মজা হয় না। কিন্তু কথাটা একেবারে মিছেও নয় সেবা। মিলিয়ে দেখে দেখে তাই আমার মনে হয় আর পুরো পাগল নিয়ে ঘর করা বরং সোজা, কিন্তু আধা পাগল নিয়ে যারা সংসার করে তারাই জানে তার জ্বালা কতখানি।'

সেবা বলল, 'উনি বুঝি—'

নীরজা বললেন, 'ওই রকম স্বভাব। কাল তো তবু দশটায় ফিরেছেন। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে জড়বাদ নিয়ে ঝগড়া করতে করতে গড়ের মাঠে রাত দুটো বাজিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই মিলে ছুটোছুটি, হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি। ও-মানুষকে দিয়ে কি বিশ্বাস আছে? ওঁকে ধমক না দিলে চলে?'

সেবা একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক।'

নীরজা বললেন, 'আর বাতিক যে কখন বাড়বে তার কিছু ঠিক নেই। এ রোগ তো আর অমাবস্যা পূর্ণিমা মেনে চলে না। এর সীজন, আউট অব সীজন নেই।'

সেবা এবার একটু তরলকণ্ঠে বলল, 'মিলিয়ে দেখেছেন নাকি মামীমা?'

নীরজা আবার চোখ তুলে তাকালেন সেবার দিকে, কিন্তু এবার আর ধমক দিলেন না। হেসেই বললেন, 'মেলাতে মেলাতে বুড়ো হয়ে গেলাম, আবার বলে—মিলিয়ে দেখেছেন নাকি! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ওই চেয়ারটা টেনে বস।'

অনুরোধের মধ্যে আদেশের সুর মেশানো ছিল। সেবা তা অমান্য না করে বসল চেয়ারটায়। নীরজা অফিসের ফাইল আর চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে পা তুলে বসে বললেন, 'সেই যে একটা গান আছে না?—'তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।' সাঁজবেলা কেন, রাতই তো হয়ে এল প্রায়। কিন্তু সুর আর মিলল না সেবা। কি করে মিলবে? তিনি কেবল বলে এলেন: ডোণ্ট, ডোণ্ট, ডোণ্ট—না না না। এটা কোরো না, সেটা করো না, ওদিকে

যেয়ো না, সেদিকে তাকিয়ো না। দিন রাত এই না না শুনতে শুনতে আমার ঘেন্না ধরে গেল সেবা। আমি ছেলেমেয়েদের শেখালুম ডু এভরিথিং, গো এভরিহোয়ার, সী ওয়ার্লড অ্যাণ্ড সী লাইফ।'—উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন নীরজা। সেবা অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ বাংলা ছেড়ে ইংরেজীতে কথা বলতে লাগলেন মামীমা। বড়মামা পারতপক্ষে একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু মামীমা মাঝে মাঝে দু-চার কথা ইংরেজী বলেন। মনের রাগ আর উত্তেজনা বাড়লে ইংরেজী শব্দের সংখ্যা বাড়ে। সে ইংরেজীর উচ্চারণ ভুল হোক শুদ্ধ হোক, গ্রামার ঠিক থাকুক আর না থাকুক, গ্রাহ্য করেন না।

নীরজা বলতে লাগলেন, 'তাই বলে আমি ওদের মানুষ করতেই চেয়েছিলাম। বাঁদর যদি হয়ে থাকে সে দোষ আমার নয়, ওদের নিজেদের। দেখ সেবা, মেয়ে হয়ে জন্মেছ, তোমারও একদিন সব হবে। স্বামী সংসার সন্তান, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ তুমিও নেবে। আশীর্বাদ করি সব নিয়ে যেন সুখী হতে পার। বড় হয়ে বুঝবে সন্তান যতক্ষণ পেটের মধ্যে থাকে, কোলের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে মায়ের। তারপর সেই বাচ্চার যখন বোল ফুটল, চোখ ফুটল, সে যখন হাঁটতে চলতে শিখল, আরও বড় হয়ে গেল, তখন আর সে একা মায়ের নয়।'

সেবা তর্ক করল না, সায় দিয়ে বলল, 'সে কথা ঠিক মামীমা।'

নীরজা আঙুল দিয়ে কাচের আলমারিটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওর মধ্যে ওদের ছেলেবেলার পুতুলগুলো এখনো কেমন সাজানো রয়েছে তাই দেখ। অমন করে খেলার পুতুলই রাখা যায়, কিন্তু রক্তমাংসের পুতুলগুলিকে বেশী দিন রাখা যায় না সেবা। তুমি চাও আর না চাও তারা তোমার কাচের আলমারি ভেঙে বেরিয়ে পড়বেই পড়বে। তারপর যদি ভাগ্য, ভগবান আর কর্মফল মানো তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। আর সে সব যদি না মানো তা হলে স্বামী বলবে—স্ত্রীর দোষ, স্ত্রী বলবে—স্বামীর দোষ। আর ছেলেমেয়ে বাপ-মার সেই কোঁদল শুনে মজা দেখবে।'

সেবা অবাক হয়ে গেল। মামীমা সেবার মায়ের মত শুধু ঘর-সংসার

রান্নাবান্না নিয়ে থাকেন নি। তিনি নিজের মত করে এ সব কথা ভেবেছেন নিজের আচার-আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজতে চেয়েছেন, কিছু না কিছু কৈফিয়তও খাড়া করেছেন। এই বিস্ময়ের ফলে মামীমার ওপর তার শ্রদ্ধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকখানি বেড়ে গেল।

সেবা বলল, 'মামীমা, আপনিও বুঝি অনেক পড়াশোনা করেছেন? নইলে এত কথা আপনি জানলেন কি করে?'

নীরজা একটু হেসে বললেন, 'না সেবা, পড়াশোনা করব কোত্থেকে? ওটা তোমার মামার এক্তিয়ারে। আমি যেটুকু শিখেছি তা শুধু দেখে শুনে, ঘা খেয়ে আর দুঃখ পেয়ে পেয়ে।

একটু বাদে আবার বললেন, 'তোমার মামার ধারণা কি জান? এই সংসারটা একটা কাদার তাল। তাকে তিনি দুই হাতের তালুর মধ্যে রেখে যেমন করে গড়বেন তা যেন তেমনিই গড়ে উঠবে। অমন করে নিজেকেই গড়া যায় না, তো পরকে। বই দেখে দেখে রান্না করার মত বই পড়ে পড়ে উনি সংসার গড়তে চান। সে রান্নায় কি স্বাদ থাকে? সে সংসারে কি সুখ থাকে সেবা?'

নীরজা আবার তাঁর ফাইলটি টেনে নিতে যাচ্ছিলেন, সেবা ফের আবেদনের ভঙ্গিতে বলল, 'মামীমা, আমি বরং কয়েকদিন ঘুরেই আসি।'

নীরজা আবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। মুখে একটু হাসি টানলেন, কিন্তু গলার স্বরটা এবার আর কোমল করলেন না। কঠিন আদেশের সুরেই বললেন, 'না, এখন আর তোমার কোথাও যাওয়া হতে পারে না। যেতে হয় পরে যাবে। ভেবে-চিন্তে নিই, ঠাকুরঝিকে চিঠিপত্র লিখি, তারপর আমরাই ডিসাইড করব—তুমি কোথাও যাবে, কি যাবে না। ফোনটা ও-ঘর থেকে নিয়ে এস তো, আমি দত্তর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

সেবা আর কোন কথা বলবার সময় পেল না।

বীথিকাকে একটু সুপারিশ করতে বলায় সে হেসে বলল, 'অমন কাজ করিস নে। মার পারমিশন ছাড়া কোথাও বেরুলে সে তোকে পুলিস দিয়ে

ধরিয়ে আনবে। তাকে চিনিস নে। সপ্তরথীর না হোক, এ আমাদের চার রথীর বূ্যহ। এখানে ঢোকবার পথ আছে, বেরুবার পথ নেই।'

বড়মামার ঘরে ইচ্ছা করেই সেদিন আর গেল না সেবা। কেমন যেন সংকোচ লাগতে লাগল। তিনিও আর সেবাকে ডাকলেন না। সেদিন তিনি নির্জলা উপবাস করে মৌন হয়ে রইলেন। তাতে নাকি আত্মবিশ্লেষণ, আত্মবিচার আর আত্মশুদ্ধির সুবিধা হয়। না খেয়েই অফিসে চলে গেলেন। কারও অনুরোধ রাখলেন না। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে আবার বসলেন বইপত্র নিয়ে। সভ্যতা কি জড়বাদেব দিকেই এগোচ্ছে, না, অধ্যাত্মবাদের দিকে? কিসে তার সত্যিকারের মঙ্গল?—জীবনভোর এই একটিমাত্র প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে চলেছেন। সেই সন্ধানে আজও তাঁর কোন ক্লান্তি নেই। বাঙালী সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পুরনো বিষয়টি আজও তাঁর নবতম গবেষণার বিষয়।

তৃতীয় দিনে একখানা গল্পের বই আনবার জন্যে আবার তাঁর ঘরে ঢুকল সেবা। তিনি অফিসে বেরিয়ে গেছেন। তবু তাঁর অস্তিত্ব যেন এই বইয়ে-ঠাসা ছোট ঘরখানির মধ্যে অনুভব করা যায়।

আস্তে আস্তে সেবা তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। বইতে কাগজ-পত্রে এলোমেলো টেবিলটি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়ল। পরশু দিনের তারিখটি আজ পর্যন্ত সরিয়ে রাখা হয় নি। কিন্তু বড় হরফের কালো সংখ্যাটির নীচে অপরিসর সাদা জায়গাটুকুতে তিনি সরু নিবের ডগায় অল্পবয়সের ছেলেরা যেমন মটো লেখে তেমনি একটি মটো লিখে রেখেছেন :

'The greatest glory of our life lies not in never falling but in rising every time we fall.'

তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেবা। কথাটা বার বার পড়ল, বার বার পড়ল। তারপর এই পরম আশ্বাস আর সান্ত্বনার কথাতেও তার ঘন কালো আয়ত সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

১১

দিন-দুই পরে সেবা ড্রয়িং-রুমে বসে বিকেলের ডাকে পাওয়া মায়ের এক-খানা চিঠি পড়ছিল। আগেও একবার পড়েছে। যতবার পড়ুক অর্থ একই থেকে যাচ্ছে। দোকান থেকে বাবা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছেন না। মালিকের নাকি লোকসান হচ্ছে! ভাল বিক্রি-বাটা নেই। মন মেজাজ খারাপ। সেই খারাপ মেজাজের ধাক্কা বাবার উপর গিয়ে পড়ছে। তিনি আবার বকছেন মাকে। সেবা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে আবার লেগে গেছে বাবা মার মধ্যে, মা আর ঠাকুরমার মধ্যে। সতী আর সুদেব অকারণে বকুনি আর মার খাচ্ছে।

আর এখানে মামার বাড়ীতে বসে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চালাচ্ছে সেবা। বাপ-মাকে সাহায্য করবার সে কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না। কি করবে সে? কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দু-একটা দরখাস্ত ছেড়েছে। বীথিদিকে দিয়ে শুধরে নিয়েছে ইংরেজীর ভুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন জবাব আসে নি। ছেলেদের মত মেয়েদের চাকরির বাজারও আজকাল আক্রা। বছর বছর শত শত পাস করা মেয়ে বেরোচ্ছে। কে তাকে চাকরি দেবে? থার্ড ডিভিশনে-মাট্রিক-পাস-করা মেয়েকে?

বীথিদিকে চাকরির কথা বলায় সে আধা রসিকতায় বলেছে, 'চাকরির ভাবনা কি, চল্, যাই আমাদের থিয়েটারে। সেখানে তোকে সবাই লুফে নেবে। যা একখানা চেহারা!'

শুধু চেহারাটাই তো আর যথেষ্ট নয়। চেহারাটাকে যথেষ্ট করতে সেবা চায়ও না।

মামীমাকে অনুরোধ করায় তিনি বলেছেন, 'ভর্তি হয়ে পড় আমাদের কলেজে। টাইপটা শিখে নাও, তারপর ওখানেই আমরা তোমাকে প্রোভাইড করে নেব।'

কিন্তু বড়মামার তাতেও অমত। তিনি যোগেশ্বরের সংস্পর্শে সেবাকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। টাকার জন্যে মেসোমশাই নাকি না করতে পারেন এমন কোন কাজ নেই। সেবা সে সব ভয় করে না। সে নিজে শক্ত থাকলে তাকে নোয়ায় কার সাধ্য!' সংসার তাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে, কিন্তু নোয়াতে কি পেরেছে সত্যি? কোর্টে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফৌজদারী উকিলের নির্লজ্জ জেরার যে সব জবাব সে দিয়েছিল তাতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন বাদিনী নাকি তারা জীবনে দেখে নি। লোকে মরিয়া হয়ে গেলে না পারে কি?

সে জন্যে নয়। কমার্শিয়াল কলেজে তাকে নিয়ে গিয়ে এখনই তো আর মাইনে দিতে পারবে না। বড় জোর মাইনে না নিয়ে কাজ শেখাতে পারবে, তাতে সেবার সমস্যার সমাধান হবে না। তবে চাকরি শিগগির জুটুক আর না জুটুক টাইপটা সে শিখে রাখবে।

জয়ন্তদাকে বলে কোন লাভ নেই জেনেও চাকরির কথাটা তুলেছিল সেবা। তিনি বলেছেন, তোমার বুঝি হাত-খরচের জন্যে টাকার দরকার? তা এক কাজ কোরো। মাঝে মাঝে আমার পকেট থেকে কিছু কিছু তুলে রেখো। তাতে আমার অন্তত খানিকটা পুণ্য অর্জন হবে।

এরা সবাই ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে কথা বলে। ব্যঙ্গটা যে কাকে তা সব সময় বুঝতে পারে না সেবা। বোধ হয় কিছু বলবার জন্যে বলে না, ভঙ্গির জন্যেই বলে।

এই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের মেয়ে-বউদের সঙ্গেও সেবা আলাপ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুল-কলেজে যায়। কেউ কেউ বা চাকরি-বাকরি করে কিন্তু তাদের কারও কাছে চট করে চাকরির কথাটা বলতে সংকোচ হয়েছে সেবার। দেখে দেখে এইটুকু জ্ঞান তার হয়েছে, এখানে অল্প আলাপে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে নেই। তাতে লোকে গেঁয়ো বলে মনে মনে করুণা করে, কিন্তু সত্যিকারের কোন উপকার করে না।

শুভেন্দু কখন এসে সেবার ঠিক সামনের সোফাটায় বসেছে তা সে লক্ষ্য করে নি। সিগারেটের ধোঁয়ায় একটু কাশি আসায় হঠাৎ সচেতন হয়ে

উঠল। শুভেন্দুর পরনে আজ চকোলেট রঙের স্যুট, তার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন টাই। তার কিছুই সাদা নয়, হাতের সিগারেটটি ছাড়া। চমৎকার মানিয়েছে শুভেন্দুবাবুকে।

লুঙ্গি-পাজামাতেও ওঁকে নাকি চমৎকার মানায়।—এ কথা বীথির মুখেই শুনেছে সেবা। ধোঁয়ায় আর একবার কাশতেই শুভেন্দু সঞ্চ ধরানো সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সেবা চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে রাখতে রাখতে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও কি! ফেলে দিলেন যে?'

শুভেন্দু একটু হেসে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করছিল, তাই শাস্তি দিলাম। বেশী বিরক্ত করলে সিগারেটের মালিকেরও এই দশা হবে।'

ওর কথা বলবার ভঙ্গি দেখে সেবা না হেসে পারল না। বাড়ির চিঠি পেয়ে মনটা ভারাক্রান্ত ছিল, তা বিনা চেষ্টায়, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, লঘুতর হল। সেবা হেসে বলল, 'একখানা চিঠি পড়ছিলাম।'

শুভেন্দু বলল, 'তা দেখতে পেয়েছি। ভয় নেই, কার চিঠি সে কথা শুনতে চাইব না।'

সেবা বলল, 'চাইলেও কোন দোষ নেই। আমার মার চিঠি।'

শুভেন্দু বলল, 'এবার আপনি আমাকে হতাশ করলেন। আপনার বয়সের কোন মেয়ে মার চিঠি অত মনোযোগ দিয়ে পড়ে না।'

পুরনো রসিকতা। তবু একটু আরক্ত হয়ে উঠল সেবা। কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন পর্যন্ত তেমন চিঠি সে একখানাও পায় নি। যে সব টুকরো কাগজ পেয়েছে সেগুলোকে চিঠি বলা চলে না। ভীরু কম্পিত হাতের সাঙ্কেতিক দুটি একটি লাইন। সেবা তা না পড়েই দুর্বৃত্তের স্পর্ধাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে।

শুভেন্দু বলল, 'কি ভাবছেন সেবা দেবী?—ভঙ্গিতে আধা ব্যঙ্গ।'

সেবা একটু চমকে উঠল। তার পর শুভেন্দুর কথার জবাবে বলল, 'বীথিদি থিয়েটার করে বলে আপনিও কি থিয়েটারী ঢঙে কথা বলবেন? ওসব দেবী-টেবী স্টেজ আর স্ক্রীনেই ভাল শোনায়, আমার মোটেই ভাল লাগে না।

'তা হলে কি বলব ? মিস সরকার ?'

'তাই বা কেন ? আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন, 'তুমি' বলবেন। আপনাকে তো আগেও কদিন বলেছি। আপনি বড্ড ভুলে যান।'

শুভেন্দু বলল, 'বাধ্য হয়ে ভুলি। কোন মেয়ে 'তুমি' বলবার অধিকার দিলে আমি তৎক্ষণাৎ সুবোধ বালকের মত তা হাত পেতে নিই। কিন্তু একটি শর্তে। আমি যাকে 'তুমি' বলি, তাকে 'তুমি' বলাই। এ দিক থেকে আমি ঘোরতর সাম্যবাদী।'

সেবা বলল, 'কিন্তু আমার বেলায় আপনার সেই সাম্যবাদ খাটবে না। আমি আপনাকে কিছুতেই 'তুমি' বলতে পারব না। আপনি আমার চেয়ে বয়সে কত বড় !'

এবার যেন একটু ঘা খেল শুভেন্দু। মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সৌন্দর্য আর তার স্রষ্টা দ্রষ্টার মধ্যে বয়সের ব্যবধান কোন ব্যবধানই নয়। এই কঠিন কঠিন শব্দে সেবাকে বিস্মিত বিমূঢ় করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের ভঙ্গিতে হাসল শুভেন্দু। তার পর কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'হায় রে ভাগ্য ! তুমি শুধু, আমার বয়সটাই দেখলে। এতক্ষণ ধরে যে বয়স্যগিরি করলাম তা কি একেবারেই বিফলে গেল ? আমি কি তোমার বড়মামার চেয়েও বড় ?'

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল সেবা। আর শুভেন্দু অপলক মুগ্ধ চোখে একটি শুভ্র-জ্যোৎস্না-ধোয়া হাসির ঝরনার দিকে তাকিয়ে রইল। উৎকর্ণ হয়ে রইল মধুর কলনাদে। এমন একটি রূপের ঝরনার জন্যে, রূপের ঝরনার মধ্যে প্রাণ বিসর্জন করা যায়, নিজেকে একটু সঙ সাজানো তো সামান্য কথা।

তাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেবা হঠাৎ থেমে গেল। শুভেন্দুর ওই চোখের দৃষ্টি প্রথম দিন এসেই সেবা লক্ষ্য করেছিল। সেদিন কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু আজ তো আর বলতে বধা নেই। এই তিন মাসের মধ্যে হাসিতে ঠাট্টায়, একসঙ্গে বসে তাস খেলে, বীথি আর তাকে নিয়ে পাশাপাশি বসে থিয়েটার-সিনেমা দেখে, দুজনকে নিয়ে গাড়িতে করে বেড়িয়ে এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয় হয়ে উঠেছে শুভেন্দু যে, তিন বছরেও তা কেউ

হতে পারে না। তাই আজ আর সমালোচনা করতে তেমন সংকোচ নেই সেবার। একটু হেসে সেবা বলল, 'শুভেন্দুবাবু, একটা কথা বলব, যদি রাগ না করেন।'

শুভেন্দু বলল, 'রাগ করব কেন সেবা? আমি রাগ করলে তা হবে চণ্ডালের রাগ। আর তোমার মত দীপ্তিময়ী যখন রাগ করবে, তা হবে দীপক—উদ্দীপক। রাগ তুমি নিজেই করেছ সেবা। বল, কি বলবে?'

সেবা স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, রাগ করেছি শুভেন্দুবাবু। আপনার সবই ভাল, কিন্তু মেয়েদের দিকে তাকাবার ভঙ্গিটা আপনার ভাল না।'

শুভেন্দুর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। সেবার মত ওই এক ফোঁটা মেয়ে —এ বিট অফ ওম্যান—তাকে যে এমন সোজা স্পষ্ট ভাষায় অপমান করে বসবে তা সে ভাবে নি। সেবা যে একটু গেঁয়ো তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুভেন্দু যতক্ষণ সেবার রূপ তার দু চোখ ভরে নিচ্ছিল, সেবা সেই মুহূর্তগুলিতে শুভেন্দুর চোখে শুধু কুরূপ প্রত্যক্ষ করেছে—এ কথা ভেবে তার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য, শুভেন্দু আজ প্রতিবাদ করল না, আত্মসমর্থনের চেষ্টা করল না, শুধু বিষণ্ণ করুণ গম্ভীর স্বরে বলে যেতে লাগল, 'তুমি ঠিকই বলেছ সেবা। ওই চোখ, ওই চোখ। **I am also in trouble with that devilish pair of eyes. They betray me— they betray me always.** বিল্বমঙ্গলের মত আমি নিজেও কতবার বলেছি—'চেয়ে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন!' সুরদাসের মত প্রার্থনা করেছি—হে সৌন্দর্যের দেবী, 'তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারই হোক'। কিন্তু শুধু চোখ দুটি উপড়ে ফেললে কি হবে সেবা? চোখ গেলেও কান থাকবে, ঘ্রাণশক্তি থাকবে—শুধু চোখ গেলেই দেহের তৃষ্ণা যাবে না। তাই সেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্যে আমি ভিন্নপথ নিয়েছি সেবা। তাকে অবদমিত করে নয়, অবনমিত করে নয়—তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে। শুধু তোমার বড়মামার ঈশ্বরই যে 'স্বে মহিম্নি' —স্বমহিমায় বিরাজ করেন তাই নয়, এই পৃথিবীর সব কিছুই তার নিজ নিজ মহিমায় ভাস্বর।'

সেবা বিমুগ্ধ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। সেই মুহূর্তে শুভেন্দুকে পরম ভাস্বর বলে মনে হল তার। বড়মামার ঘর, বড়মামার সান্নিধ্য তাকে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন থেকে যে এক স্বতন্ত্র স্তরে নিয়ে যায়, শুভেন্দুও যেন সেবাকে তেমনই এক উর্ধ্বলোকে নিয়ে আসে। সেবা শুনেছে, ক্লাসের বিজ্ঞান-রীডারে পড়েছে—যত উঁচুতে ওঠা যায় তত নাকি বাতাস পাতলা হয়ে আসে আর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তবু মানুষের উঁচুতে ওঠার সাধ মেটে না। সেবারও তাই হল। এখানে বসে থাকতে তার কিসের যেন একটা কষ্ট হচ্ছে, নিশ্বাস আটকে আসছে, তবু উঠে যেতে পারছে না। অনেক সময় স্বপ্নে এমন হয়েছে সেবার, চোখ মেলে চাইতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু তাকাবার ক্ষমতা নেই। ঘুমের আবেশে পাহাড়ের মত কি একটা খাড়া উঁচু জিনিসে সে কেবলই উঠে যাচ্ছে, কেবলই উঠে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে, তবু যেন নেমে পড়বার জো নেই, নেমে আসবার উপায় নেই। এই কলকাতায় এসেই সেই স্বপ্নটা দেখেছিল সেবা। সেই পাহাড়ের চূড়ায় কে দাঁড়িয়ে ছিল —বড়মামা, না, শুভেন্দু, তা যেন ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। একবার যেন মনে হয়েছিল দুজনেই আছে, দুজনে মিলে একজন।

সেবা জানে, শুভেন্দু সাধারণ একজন কাগজের দোকানদার নয়। কলকাতার বড় বড় দোকানগুলোর তুলনায় তার দোকানকে তত বড় বলা যায় না। কিন্তু দোকানীই একমাত্র পরিচয় নয় শুভেন্দুর। তা যদি হত বীথি তার ধারেও ঘেঁষত না। বার বার আঘাত অপমান সহ্য করে ফিরে ফিরে যেত না তার ফ্ল্যাটে। সে ফ্ল্যাট সেবাও একদিন দেখে এসেছে। বীথির সঙ্গেই গিয়েছিল। তাদের দুজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল শুভেন্দু। বিরাট ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটের চারখানা ঘরে যেমন সেবারা পাঁচজন থাকে, ঝি চাকর নিয়ে সাতজন থাকে—তেমন ফ্ল্যাট নয়। তার একখানা ঘরেই এর চারখানা ঘর ধরে। আর সেই বিশালায়তন বাড়িতে একা থাকে শুভেন্দু। সেবার বড়মামার মতই একা। একটি নেপালী আর একটি বিহারী চাকর অবশ্য আছে। কিন্তু তারা তো আর শুভেন্দুর সঙ্গী নয়। শুধু তারা কেন তার কাছে আরও যারা যারা আসে—বীথিকা যূথিকারা,

তারা কেউ দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী নয় শুভেন্দুর, রাত্রিবেলার স্বল্পক্ষণের অতিথিনী। এ সব কথা বীথিকার মুখেই শুনেছে সেবা, আর শুনে তার গা-ঘিনঘিন করেছে। অশ্রদ্ধায় বীতস্পৃহায় ভরে উঠেছে মন। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখেছিল, শ্রদ্ধা করবারও যথেষ্ট বস্তু আছে। শুভেন্দুর বাড়ি তো নয়, যেন এক চিত্রশালা আর মিউজিয়াম। এক ঘরে শুধু ছবির কালেক্‌শন। দেশী বিদেশী ছবি, বিদেশী ছবিই বেশী। সেবা সে-সব ছবি এর আগে দেখে নি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বাংলা মাসিক কাগজের পাতায় দু-একটা প্রিণ্ট দেখেছে। ম্যাডোনার প্রশান্ত মাতৃমূর্তি, রহস্যহাসিনী মোনালিসা। কখন বা শুধু কতকগুলি ফল। শুধু ফল। কিন্তু নির্জীব নয়, মানুষের চেয়েও যেন বেশী জীবন্ত। মানুষের চেয়েও বেশী মুখর তাদের কামনা আর বাসনা। বড়মামীর সেই ফলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল সেবার।

ফলের ছবি, ফুলের ছবির সঙ্গে ঝড়ের ছবি, সমুদ্রের ছবি—কত ছবিই যে দেখেছিল সেবা তার ঠিক নেই। ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে শুভেন্দু আর্টিস্টদের নাম বলে বলে যাচ্ছিল।

সেবা একসময় মুখ ফিরিয়ে হেসে বলেছিল, 'শুভেন্দুবাবু, পুরুত যেমন বৃদ্ধির মন্ত্র পড়ে, তাতে যেমন চোদ্দ পুরুষের নাম লাগে, আপনিও যে তেমনি গড়গড় করে একরাশ নাম বলে যাচ্ছেন, আমি যে কিছুই মনে রাখতে পারছি নে!

শুভেন্দু হেসে বলেছিল, 'দরকার নেই সেবা। সত্যিকারের আর্টিস্টরা তাদের ছবি মনে রাখলেই খুশী হন।'

আর একটি ঘরে শুধু মূর্তি আর মূর্তি। পাথরের কাঠের ব্রোঞ্জের, আরও কি কি সব ধাতুর। নাম জানে না সেবা। বুদ্ধমূর্তি, শিবের মূর্তি, নটরাজের মূর্তি। কিন্তু নগ্ন নারীমূর্তি সংগ্রহের দিকেই যেন ঝোঁক বেশী শুভেন্দুর। ছি ছি ছি! তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না সেবা। তাকালে আবার চোখ ফেরানোও যায় না।

তার সেই ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব দেখে শুভেন্দু হেসে বলেছিল, 'লজ্জা কি! ভাল করে চেয়ে দেখ। ওরা নগ্ন নয় সেবা। মগ্ন, নিমগ্ন আপন রূপের সাগরে।'

তার পরের ঘরে লাইব্রেরি। ঘর-ভরা আলমারি। আর আলমারি-ভরা শুধু বই আর বই। সে বইয়ের সংখ্যা বড়মামার ঘরের বইয়ের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। আর তার সবই যে শুধু নাটক নভেল যৌন-বিজ্ঞান তা নয়। উঁচুদরের দর্শন-বিজ্ঞানও আছে। দু-একখানার নাম পড়েই সেবা তা বুঝতে পারল।

সেবা বীথির দিকে চেয়ে বলেছিল, 'দোকানদার আবার বই পড়ে নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম, সাদা কাগজ নিয়েই শুধু ওঁর কারবার।'

বীথি সগৌরবে বলেছিল, 'তোকে তো বলেছি, দোকানদারের বেশটা শুভেন্দুর ছদ্মবেশ। আসলে ও সমঝদার।'

শুভেন্দু সবিনয়ে বলেছিল, 'কোন্ বেশটা যে আসল আর কোন্ বেশটা যে ছদ্ম তা অত সহজে বলা যায় না বীথি। এই মুহূর্তে যা স্ববেশ, পরের মুহূর্তে তা ছদ্মবেশ। তারা একই সঙ্গে মেশামেশি করে আছে।'

সেবা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি সব বই পড়েছেন?'

শুভেন্দু লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে মাথা নেড়েছিল: 'না, সব পড়ি নি। পড়ব বলে আশায় আছি।'

তার বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সেবা। বড়মামাও তো ওই কথা বলেন। তিনিও বলেন না—সব পড়েছি, সব জেনেছি, সব বুঝেছি। তিনিও বলেন না, সব-পেয়েছির দেশে আছি। যাঁরা জ্ঞানের পথে বিচরণ করেন, তাঁরা কেউ তা বলতে পারেন না। তা শুধু বলতে পারেন ভক্ত। সেই ভক্তদের ওপর সেবার এখন পর্যন্ত কোন ভক্তি আসে নি।

তারপর তাদের ডাইনিং টেবিলে নিয়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। মাংসের নানারকম খাবার। ঝকঝকে কাঁটা চামচ। শুভেন্দু আর বীথিকা সেই কাঁটা-চামচে খেতে লাগল। তা দেখে সেবারও লোভ হল ওই রকম করে খায়। লোভের সঙ্গে ভয়ও আছে। যদি ভুল হয়ে যায়, যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায়! তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। সেবা একবার ধরতে যায় আবার ফিরে আসে। কাঁটা-চামচ তো নয়, যেন মারাত্মক দুই অস্ত্র।

বীথিকা তা দেখে হেসে বলেছিল, '**I know now where the shoe**

pinches. আচ্ছা বাঙাল, সেদিন চাঙোয়ায় নিয়ে গিয়ে তোকে অত করে শেখালুম—'

শুভেন্দু কিন্তু ব্যঙ্গ করে নি। সে উদার সহিষ্ণুতায় স্মিতমুখে বলেছিল, 'না না, তুমি হাত দিয়েই খাও সেবা। তাতেই ভাল দেখাবে। তোমার হাতের পাঁচটি আঙুল কাটাও নয়, কাঁটাও নয়, ফুল। পাঁচটি চাঁপার কলি। আমাদের কাঁটার কলির চেয়ে অনেক সুন্দর।'

এই পুরনো উপমা আর অতিশয়োক্তির অলঙ্কারে সেবার মুখ লজ্জায় লাল হয়েছিল। আর বীথিকার মুখ রাগে। সে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'থাম থাম। ওই একই পুরনো কথা কত জনকে বলবে?' শুভেন্দু হেসে বলেছিল, 'কথা তো পুরনোই হয়। নতুন করে শোনার মধ্যে তার নতুন অর্থ-গৌরব। 'এক ফাগুনের গানের কথা আর ফাগুনের কানে কানে'। নারীর রূপের কথা অমৃতসমান, শুভেন্দুশেখর ভনে শোনে রূপবান। আমি পুণ্য চাই নে বীথি, আমি চাই রূপ, শুধু রূপ।'

তারপর পাশের ঘরে শুধু বীথিকাকেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেবা বুঝেছিল, সেই নিভৃতি আদর করে বীথির মান ভাঙাবার জন্যে।

খানিক বাদে বিদায় দেওয়ার সময় বীথিকে বলেছিল, 'ওকে নিয়ে আবার কবে আসবে?' বীথি একটু হেসে জবাব দিয়েছিল 'ওকে নিয়ে আর আসব না। তা হলে একদিন আমাকে না নিয়েই ও আসতে শুরু করবে।'

এই খোঁটা শোনার পর সেবা আর বীথির সঙ্গে যায় নি, কিন্তু শুভেন্দু অনেকবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

কেন যে আসে শুভেন্দু তা সেবা বুঝতে পারে না—এমন নির্বোধ সে নয়। বুঝতে পেরেও ধরা-ছোঁয়া দেয়নি। ধরা দেয়নি, কিন্তু ছোঁয়া যে একেবারে দেয় নি—এ কথা কি করে বলবে? শুভেন্দু অনেক দিন ওকে গাড়ি থেকে হাত ধরে নামিয়েছে। বীথির সাক্ষাতেই ওর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে রক্তগোলাপ। সেবা আপত্তি করলেও শোনে নি।

এর সবই কি শুভেন্দুর বিলাত-ফিরতি কায়দা? বীথিকা বলেছে, শুভেন্দুও প্রথমে লেকচারার হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকে। কিছুদিন পরে বিলেত

যায়। আসবার সময় শ্যামবর্ণা আর একটি বাঙালী মেয়েকে সঙ্গে করে আনে। সে নাকি ছাত্রী আর বান্ধবী। ওর বউ সেই বন্ধুত্ব সহ্য করতে না পেরে বিষ খায়। আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পরেও শুভেন্দু কি করে বলে—নারীর রূপ অমৃত সমান। ওর মনে কি মায়া-দয়া নেই, শুধু রূপতৃষ্ণাই আছে?

'সেবা!'

শুভেন্দুর ডাকে সেবাব চমক ভাঙল। চোখ তুলে তাকাল শুভেন্দুর দিকে। ওর এতক্ষণের আচ্ছন্ন ভাবও মনে মনে উপভোগ করছিল শুভেন্দু। লক্ষ্য করছিল মুগ্ধ কুরঙ্গিণীকে। শুভেন্দু এখন যদি সহস্রচক্ষু হয়েও ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সেবার কিছু বলবাব সাধ্য নেই, মুখ ফিরিয়ে নেবার সাধ্য নেই। এই রকমই হয়। ওদের প্রাথমিক বিমুখতাকে ভয় পেলে চলে না। সেবা বলল, 'বলুন।'

শুভেন্দু বলল, 'আজ তোমার কাছে একটা কথা নিয়ে এসেছি। তুমি তো কোনদিন বল নি, মাসীমা কাল ফোনে বললেন—তোমার একটা চাকরিব দবকার, জয়ন্তও অবশ্য এর আগে দু-একদিন বলেছে।'

মার চিঠিখানাব কথা মনে পড়ল সেবার। মনে পড়ল বাবার আধ-বেকাবত্বেব কথা। সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, চাকরির দরকার। আছে আপনার খোঁজে?'

শুভেন্দু বলল, 'আছে। খোঁজ নয়, আমি একেবারে তোমার অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট লেটার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

সেবা বিস্মিত উল্লাসে বলল, 'সে কি! কোথায়? কতটাকা মাইনে?'

শুভেন্দু শেষ প্রশ্নটির জবাব দিল 'দু'শো টাকা।'

দু'শো!—একটু দম নিয়ে সেবা বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

তার বাবার তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে গুনলেও যে দু'শো হয় না।

শুভেন্দু বলল, 'মোটেই ঠাট্টা করছি নে।'

'কোথায়? কোন্ অফিসে?'

শুভেন্দু বলল, 'আমার অফিসে।'

সেবা যেন নিবে গেল। মৃদুস্বরে বলল, 'ও, আপনার অফিসে! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

শুভেন্দু অত সহজে নিরুদ্যম হওয়ার ছেলে নয়। সে হেসে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? আমার অফিসটা কি অফিস নয়? না কি সেখানে কোন কাজকর্ম হয় না?'

সেবা বলল, 'হবে না কেন? কিন্তু আপনাদের অফিসে কি মেয়েরা কাজ করে?'

শুভেন্দু বলল, 'করে বইকি। আমার স্টেনো আছে সে মেয়ে, আমার ক্যাশিয়ার সেও নারীজাতীয়া।'

এ কথায় সেবার মনে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুটি কাঁটার খোঁচা লাগল। না চাইলেও গলায় এল অভিমানের সুর। সেবা বলল, 'কিন্তু আমি তো শর্টহ্যাণ্ডও জানি নে, ক্যাশের কাজও জানি নে। বড়মামা বলেছেন আমার যা বিদ্যে তাতে রুটিন-গ্রেড ক্লার্কের চাকরি হতে পারে। সে প্রায় দপ্তরীর কাজের মত। আপনি বড়লোক, আপনি দু'শো টাকা দিয়ে দপ্তরী রাখতে পারেন। কিন্তু আমি তো আর তা নিতে পারি নে।'

শুভেন্দু একটু হাসল: 'বড়লোকের খোঁটাটা কয়েক বছর আগেও ছিল। কিন্তু আমি এখন তা প্রায় মুছে আনবার জো করেছি। বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে তাঁর পিতৃস্নেহ আমার কাছে লাখ দশেক টাকায় বিক্রী করেছিলেন। তাঁর সেই স্নেহের দান আমি পরম অশ্রদ্ধায় যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করতে চেয়েছি। এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সেই টাকায় একটা পাবলিশিং বিজনেস আরম্ভ করব ভেবেছি। কারণ বাবা লেখাপড়াটা ভালবাসতেন। তাঁর প্রিয় লেখক-বন্ধুদের কিছু ম্যানাস্ক্রীপ্ট্ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, ছাপবেন বলে। তা আর ছেপে যেতে পারেন নি।'

শুভেন্দু একটু থামল, পাছে ধরা গলাটা ধরা পড়ে। সেবা তা লক্ষ্য করল। কিন্তু কোন কথা বলল না। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শুভেন্দু বলল, 'কিন্তু তোমাকে আমি দপ্তরীর কাজে লাগাতে পারব না সেবা। পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট করেই নেব। সে সম্মানে তুমি যদি অসম্মান বোধ

কর, সাধারণ অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্টই হবে। এমন কিছু তাড়া নেই। ভেবে-চিন্তে জবাব দিয়ো। ও ভেকেন্সি শিগগির ফিল্ড-আপ হবে না।'

শুভেন্দু কতখানি ঠিক কথা বলে তা পরীক্ষা করার জন্যে সেবা জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার কি আপনি সত্যিই এনেছেন?'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি শৈলেনবাবুর মত সত্যবাদী নই। তবে আমার স্বভাবেরও ব্যতিক্রম আছে। যুধিষ্ঠির একটি মিথ্যে কথা বলে নরক দেখেছিলেন, আমি যখন দু-একবার স্বর্গ দেখি তখন দু-একটি সত্য কথা বলি। আগে পুণ্যফল, তারপরে কর্ম।'

বুক-পকেট থেকে সত্যি সেবা সবকাবের নাম টাইপ করা ব্রাউন রঙের একখানা অফিস-খাম সেবার দিকে এগিয়ে দিল শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আর একটি হৃদয় জয় করে নিল। শুভেন্দুব বিরুদ্ধে যত কুৎসা সে শুনেছিল সব ভুলে গেল সেবা। যত সংশয় সন্দেহ অভিযোগ উঠেছিল মনে, সব মিলিয়ে গেল। মানুষকে বিশ্বাস করায় কি সুখ, মানুষকে ভালবাসায় কি আনন্দ! সেবার মনে হল ব্রাউন রঙের মত এমন চমৎকার রঙ দুনিয়ায় আর দুটি নেই। চিঠিখানা নিতে হাতখানা একটু কেঁপে গেল সেবার। প্রথম নিযোগপত্র তো নয়, যেন প্রথম প্রেমপত্র। জীবনে সব সত্য-প্রেমই প্রথম প্রেম। আর সব প্রেমেব মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। এই মুহূর্তে সমস্ত সত্তা দিয়ে তা অনুভব করল সেবা।

আর রূপদক্ষ শুভেন্দু, রূপপিপাসু শুভেন্দু দুই চোখ ভরে দেখে নিল তরুণী রূপবতী নারীব দানগ্রহণের সেই অপরূপ ভঙ্গি। ঈষৎ কাঁপা কাঁপা চাঁপার কলিগুলি ফের দেখল, দেখল সুগোল সুন্দর দুটি ঘুমন্ত পারাবতের সন্ত জাগরণ, বিনা রঙে—শুধু অনুরাগের রঙে রঞ্জিত পেলব দুটি স্ফুরিত অধর। দুটি চোখে মৃদু আন্দোলিত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ দুটি কাজল-সরোবর, নয়নভরে দেখে নিল শুভেন্দু। মনে মনে বলল, 'চেয়ে দেখ মন, কত তোরে রাঙায় নয়ন!' বিল্বমঙ্গলের ক্ষোভ তার নয়, তার নয়। সে রূপমঙ্গলের কবি।

শুভেন্দুকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দেখে একটু বাদে সেবা বলল, 'ওকি শুভেন্দুবাবু আপনি চললেন কোথায়?'

শুভেন্দু বলল, 'এবার যাই। তুমি তা হলে ভেবে দেখ সেবা, কাজটা নেবে কি নেবে না!'

সেবা বলল, 'নেব না কেন? নিশ্চয়ই নেব। কালই জয়েন করতে পারব তো?'

শুভেন্দু বলল, 'তা পারবে। কিন্তু এত গরজ?'

সেবা একটু লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জা সামলে নিয়ে বলল, 'গরজ একটু বেশীই। আমার বাবা বড় গরিব। হঠাৎ খুব অভাবে পড়েছেন। ওদিকে গোঁড়ামিও আছে। মেয়েরা রোজগার করুক তা চান না। তবু আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা পাঠাতে হবে। বাপ গরিবই হোন আর বড়লোকই হোন, উদারই হোন আর রক্ষণশীলই হোন, স্নেহময়ই হোন আর স্নেহহীনই হোন, ভিতরে ভিতরে সব বাপের প্রাণই ছেলের জন্যে কাঁদে, মেয়ের জন্যে কাঁদে, শুভেন্দুবাবু। আবার তাদের মনও না কেঁদে পারে না। একটু আগেও তা দেখতে পেলাম।'

সেবার মুখে ঠিক এই মুহূর্তে শুভেন্দু এ সব কথা শোনার জন্যে তৈরী ছিল না। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কালই জয়েন করছ শুনে খুশী হলাম। আমি তা হলে আজ চলি।'

'সে কি, এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ, এগোই। ওঁরা তো কেউ নেই!'

সেবা বলল, 'না, ওঁরা কেউ নেই। বীথিদি স্টুডিওতে গেছেন নতুন গল্প শুনতে। যে গল্প ওঁরা করবেন সেই গল্প। বীথিদির কনট্রাক্ট হয়ে গেছে। এ বইতেও হিরোইনের রোল।'

শুভেন্দু বলল, 'শুনে খুশী হলাম। আর তোমার মামীমা?'

সেবা বলল, 'তিনিও কলেজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বড়মামাও আজকাল বেশ রাত করে ফেরেন। ছুটির পর ওঁর এক কলিগের বাসায় বসে কাজ করেন। আর জয়ন্তদার খবর তো আপনিই ভাল জানেন।'

শুভেন্দু একটু হেসে বলল, 'অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে জানি। কিন্তু কোন্ 'বারে' আছে তা ঠিক জানি নে। তা হলে তো ওঁরা কেউই নেই দেখছি।'

সেবা বলল, 'নাই বা রইলেন। তাই বলে অফিস থেকে এসে আপনি কিছু না খেয়েই চলে যাবেন? এত বড় একটা সুসংবাদ দিলেন, আর এক কাপ চাও খাবেন না?'

শুভেন্দু বলল, 'চা এক কাপ খেতে পারি। তবে তুমি যদি নিজের হাতে কর।'

'চা আমি নিজের হাতেই করি।'

শুভেন্দু বলল, 'আর নিজের ঘরে বসে যদি খাওয়াও।'

সেবা একটু হেসে বলল, 'এখানে আমার নিজের ঘর কোথায় শুভেন্দু-বাবু? যে ঘরে থাকি সেও তো বীথিদির সঙ্গে ভাগে। যাবেন সে ঘরে?'

শুভেন্দু বলল, 'যাব। ঘরের কোন ভাগাভাগি হয় না সেবা, মনেরও কোন ভাগাভাগি হয় না। অখণ্ড কালকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এক-একটি অখণ্ড মুহূর্ত। অখণ্ড মনকে টুকরো টুকরো করে ভাঙ, তার প্রত্যেকটি অখণ্ড মানিক। অখণ্ড ভালবাসাকে জনে জনে বিলিয়ে দিলেও তা খণ্ডিত হয় না। সে শুধু খণ্ডিতা নারীর অবুঝ অভিমান। প্রতিটি মুহূর্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ, নারী-পুরুষের প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিবারের মুহূর্তময় সম্পর্কও তাই। প্রতিটি মুহূর্তে সে একনিষ্ঠ। এক মুহূর্তের নিষ্ঠার সঙ্গে আর এক মুহূর্তের নিষ্ঠা নিয়ে যারা বিবাদ করে তারা নিষ্ঠার বানান জানে, অর্থ জানে না। চল তোমার ঘরে।'

প্রবল আবেগে এত তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলে গেল শুভেন্দু যে, সেবা তার সব শুনতেও পারল না, বুঝতেও পারল না। এমন করে অনেক সময় বড়মামাও বলেন। সে প্রায় স্বগতোক্তি। তাকে স্বাগত জানাতে না পারলেও তার রূপ মানুষকে মুগ্ধ করে, তার ধ্বনি মনে হয় মন্ত্রধ্বনির মত। কারণ তা মানুষের অন্ত্র-ছেঁড়া ধন। তাই তা রূপশিল্প। শিল্পের যে সাপ তা রূপময়, শিল্পের যে-পাপ তাও রূপময়, প্রকৃত রসিক জানেন সে সাপে বিষ নেই, সে পাপ নির্বিষ। সেদিন ছবি দেখবার সময় বলেছিল শুভেন্দু, সেবার মনে পড়ল। সেবা বলল, 'আপনি তা হলে ও-ঘরে গিয়ে বসুন। আমি চা টা নিয়ে আসি।'

শুভেন্দু বলল, 'শুধু চা আন। আর কিছু করতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। আমি দু-চার মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলেই চলে যাব।'

সেবা কিচেনের দিকে যেতে যেতে মিষ্টি হেসে বলল, 'কেন, অত তাড়া কিসের?'

সেই স্নিগ্ধ হাসি শুভেন্দুর সর্বাঙ্গে তাপ আর দাহের সৃষ্টি করল।

বীথিকার ঘরে গিয়ে বসল শুভেন্দু। বীথির খাট বীথির শয্যা আলমারি ড্রেসিং-টেবিল বুককেস আলনা। এমন কি টেবিলের স্ট্যাণ্ডে তার আর বীথির যুগল ফোটোও রয়েছে। তবু এই মুহূর্তে তার কথা শুভেন্দুর একবারও মনে পড়ল না। সে অধীর আর অসহিষ্ণু হয়ে সেবার জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগল। ও বড় দেরি করে ফেলছে।

খানিকবাদে সেবা এল ঘরে। সাদা ধবধবে বড় একখানি প্লেটের মাঝখানে গোল করে রাখা কি একটা নরম বস্তু। আর এক হাতে চায়ের কাপ। টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সেবা হেসে বলল, 'খান।'

শুভেন্দু বড় প্লেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ও আবার কি?'

সেবা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'সামান্য একটু মোহনভোগ। তাড়াতাড়িতে বেশী কিছু করতে পারলাম না। হরিদাস বাজারে চলে গেছে, রুক্মিণী রান্না নিয়ে ব্যস্ত—'

শুভেন্দু অধীর হয়ে বলল, 'থাক্ ও-সব কথা। কিন্তু মোহনভোগ কেন করতে গেলে? মিষ্টি আমি অমনিতেই খাই নে, তা আবার চায়ের সঙ্গে।'

সেবা অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'ও, আমি ভেবেছিলাম আপনাকে যেমন করে পারি আজ মিষ্টিমুখ করাব। কিন্তু আপনি যখন মিষ্টি একেবারে খাবেনই না, যাই, ডিমের কিছু করে নিয়ে আসি।'

দোরের দিকে দু-এক পা এগোতেই শুভেন্দু হঠাৎ ওর হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর একটু জোর করে সামনের খাটে ওকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক হয়ে বোসো ওখানে।'

সেবার মুখ ততক্ষণে বিবর্ণ হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত ভয়ে কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ। দেশহীন, কালহীন এক অন্ধকার ঘরে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা

তার মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই এক উজ্জ্বল জনপূর্ণ কক্ষ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আদালত। অন্ধকার ঘরের দৈত্যকায় বীরপুরুষদের শিকল বাঁধা সেই কাপুরুষের মূর্তি। আর তাদেরই ঠিক উল্টো দিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় একখানি শাণিত তরোয়াল। বাদিনী। প্রতিহিংসার উজ্জ্বল নিষ্ঠুর প্রতিমূর্তি। যা মৃদুনি কুসুমাদপি, তাই বজ্রাদপি কঠোরাণি।

সেবার মুখের কাঠিন্য দেখে, তার ভাবান্তর দেখে শুভেন্দু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হল। নিজের ভুল বুঝতে পারল। অনুতপ্ত কিন্তু আবেগতপ্ত ভাষায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর সেবা। আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে তোমাকে ছুঁয়েছি। আমার তা ইচ্ছা ছিল না। আমাকে তিরস্কার কর, দণ্ড দাও। তুমি মুখ ফুটে বল, আমি চলে যাই।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সেবার মন অন্য রকম হয়ে গেল। ছি ছি ছি, কার সঙ্গে সে কাদের তুলনা করছিল! মনে পড়ল শুভেন্দুর সেই ফ্ল্যাট, সেই আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী। বিদগ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃতিবান রুচিবান শুভেন্দু। উপকারী শুভেন্দু, যে এক কথায় তাকে দু শো টাকার চাকরি দিয়েছে। প্রেমিক শুভেন্দু। হ্যাঁ, প্রেমিক। যে শুধু চাকরি দিয়ে তাকে ভালবাসে নি, চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে, মুখের কাব্যময় ভাষায় অন্তরের উত্তাপ সঞ্চার করে দিয়ে, নিজের দার্শনিক প্রত্যয় দিয়ে তাকে ভালবেসেছে। আর সেই ভালবাসাকে সেবা যে মনে মনে স্বীকার করে না নিয়েছে তা তো নয়। প্রতিদান না দিয়েছে তা তো নয়। সব জেনে বুঝেও সে সেই চাকরির চিঠি হাত পেতে নিয়েছে। ওর চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাষা সব বুঝতে পেরেও ওকে ভিতরের এই নিরালা ঘরে ডেকে এনেছে। চা আর মিষ্টি করে এনেছে। কথা বলেছে হেসে হেসে। এখনই বা বলতে পারছে কই—যাও, উঠে যাও, চলে যাও এখান থেকে। পারছে না, কারণ শুভেন্দুর পাপ যেমন দুর্বার, ওর অনুতাপও তেমনই আন্তরিকতায় উত্তপ্ত। যে একটু নিন্দা করলে নিজের দুই চোখ উপড়ে ফেলতে চায়, তাকে অত সহজে চোখের আড়াল করা যায় না।

সেবা বলল, 'শুভেন্দুবাবু, অপনার যাওয়ার কি দরকার? বসুন না। কি বলছিলেন তাই বলুন।'

একটু যেন আশ্বস্ত হল শুভেন্দু। বলল, 'আমার কথা তোমার ভাল লাগে সেবা? আমাকে তোমার ভাল লাগে?'

সেবা বলল, 'লাগে।'

একটিমাত্র শব্দ। কিন্তু শুভেন্দুর মনে হল তা যেন এক অপরিমেয় অমৃতসিন্ধু। শুভেন্দু বলল, 'তা হলে অমন কবছিলে কেন।'

সেবা লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল। তাবপর আস্তে আস্তে তুলে ধরল তার সেই কাজল-কালো দুটি চোখ। সেবা বলল, 'আপনাকে ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলে বীথিদির এই ঘরে বসে, তাকে লুকিয়ে—'

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল সেবা।

শুভেন্দু বলল, 'ও, তুমি গোপনতার কথা বলছ? গোপনতা আমিও অপছন্দ করি সেবা। **I also hate this clandestine relationship from the core of my heart.** কিন্তু আমাদের সমাজ পর্দার আড়াল ছেড়ে বেরোতে সাহস পায় না। বীথির মতই তার একটা স্ক্রীন চাই, গ্রীন-রুম চাই। আমার ইচ্ছা করে কি জান? বীথি যেমন স্টেজের ওপর প্রকাশ্যভাবে প্রেম নিবেদন করে, প্রকাশ্যভাবে অ্যাডাল্‌ট্রির অভিনয় কবে, আমিও তেমনই জীবনের রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের সামনেই আমাব সমস্ত নাট্যনৈপুণ্য দেখাই। কিন্তু আমার দর্শকরা তা সহ্য করবে না সেবা। তারা আমাকে ধরে হয় জেলে দেবে, না হয় পাগলা-গারদে পুরবে।'

এবার সেবার হাসি পেল: 'আপনিও তা হলে জেল আর পাগলা-গারদের ভয় করেন?'

শুভেন্দু বলল, 'করি। সেখানে গিয়ে পচে মরে কি হবে? তাতে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না।'

সেবা বলল, 'কিন্তু শুভেন্দুবাবু, বড়মামার কাছে শুনেছি, কিছু কিছু নিজেও পড়েছি, নিজের আদর্শের জন্যে এই পৃথিবীতে কত লোক পরের হাতে বিষ খেয়েছে, আগুনে পুড়ে মরেছে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছে, জেলে গেছে, ফাঁসিতে

ঝুলেছে—তারা তো কিছুতে ভয় করে নি। আর তাতে যে তাদের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থেকেছে তাও তো বলা যায় না।'

তার্কিক শুভেন্দু, বক্তা শুভেন্দু হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে রইল। কি বলবে খুঁজে পেল না।

সেবা বলতে লাগল, 'আপনি বীথিদির মুখে নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার জন্যে কয়েকজন জেল খেটে মরছে। তারা ইচ্ছা করে যায় নি। অনেক কায়দা-কৌশল করে তাদের অ্যারেস্ট করতে হয়েছে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মামলা-মোকদ্দমা করে তাদের জেলে ঠেলতে হয়েছে। আপনি না হয় ইচ্ছা করেই গেলেন। আমার জন্যে নয়, আপনার আদর্শের জন্যে, আপনার মতবাদের জন্যে।'

স্তম্ভিত স্তব্ধ শুভেন্দু বিস্ময়ে বেদনায় বিমূঢ় হয়ে রইল। তার মুখ ছাঁইয়ের মত ফ্যাকাশে। চোখে জল আসে-আসে।

তা দেখে সেবার মনে খুব দয়া হল। সেই মন বলতে লাগল, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আর না।

কিন্তু আর একটা মন মরিয়া হয়ে রইল। সে মন সেই নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা, জনসমাজে অবজ্ঞাতা, উপহসিতা, ধর্ষিতা নারীর মন—সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসামী-পক্ষের তিনজন উকিলের বিদ্রূপপ্রশ্নে জর্জরিতা ফরিয়াদিনীর মন।

কিন্তু এ প্রত্যাঘাত শুভেন্দুকে কেন? যাকে সে শ্রদ্ধা করে, যাকে সে ভালবাসে, তাকে কেন? স্বপ্নের যে পাহাড়ে সেবা সেদিন উঠতে পারে নি, আজ বাস্তবে তাকেই কি সে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে চায়? না কি ভালবাসে বলেই এই আঘাত? স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবে না তো কার সঙ্গে করবে? দয়িতা তার দয়িতের মনে দহনজ্বালা না জ্বালালে কার মনে জ্বালাবে? আর পাবে কোথা? প্রিয়কে ব্যথা না দিলে কাকে দেবে ব্যথা?

শুভেন্দু একটু সময় পেয়ে নিজের বক্তব্য এবার গুছিয়ে নিল। সে ফিরে পেল আবার তার বাক্‌শক্তি। আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'আমি জেলে গেলে কি ফাঁসিতে ঝুললে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না সেবা। লোকে

ভাববে, একটা লম্পট শাস্তি পেয়েছে। সংগ্রামের রীতিনীতি অনেক বদলে গেছে। পাথরের অস্ত্র ছেড়ে আমরা এসেছি পারমাণবিক বোমার যুগে। আমাকে বাইরে থেকে লড়তে হবে—কলম চালিয়ে বক্তৃতা চালিয়ে দল গড়ে সঙ্ঘ গড়ে। তারা গড়বে নতুন সমাজ। সেবা, তোমার হাতখানা ধরায় তুমি আজ ফোঁস করে উঠলে, কিন্তু আমি তোমার মনের উত্তাপের আঁচ একেবারে না পেয়েছি তা তো নয়। কিন্তু মন দিয়েও তুমি যে দেহ দিতে চাও না, তার কারণ কি জান? দেহ সম্বন্ধে তোমাকে শুচিবায়ুগ্রস্ত বাতিকগ্রস্ত মরালিস্টরা অন্য কথা বুঝিয়েছে। তাদের দেশ-কাল নেই। যেমন আমাদের মত ইমমরালিস্টদেরও দেশ-কাল নেই। তারা কি আমাদের চেয়ে কম দেহবাদী মনে কর? মোটেই তা নয। তবে তাদের অ্যাপ্রোচটা ঠিক উল্টো দিক থেকে। দেহকে বাদ দিয়ে দিয়ে তারা দেহের বাদী। তার ফলে হয়েছে কি জান? বাইরের দেহ তাদের ভিতরের মনটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। দেহ ছুঁলে তারা অশুচি হয়, দেহের জন্যে তাদের জাত যায়। ঘরের বউ মনে মনে একজন পরপুরুষকে ভালবাসুক, সমাজ সংসার কিছু বলবেনা। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে হাতখানা ধরুক, সমাজের হাত তার গলা টিপে ধরবে। এদের দেহবাদী বলবো না তো কাদের বলব? আর তোমরা এই মেয়েরাও দেহবাদী।

সেবা এ কথায় ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে হাসল: 'আপনার চেয়েও?'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, আমার চেয়েও। এদিক থেকে মেয়ে আর মরালিস্ট একজাতের। তবে ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন স্বার্থে। তোমরা মেয়েরা ভাব, তোমাদের দেহের রহস্য একবার যদি পুরুষে জানতে পারল, তা হলেই তোমরা দেউলিয়া। তোমাদের নতুন কোন সম্বল আর রইল না। তাই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পুরুষকে দশম দশায় এনে হাজির করে তাকে তোমরা দেহদান কর। কিন্তু দেহের রহস্য কি অত সহজে শেষ হয়? তা মনের রহস্যের মতই অসীম, অপরিমেয়; যদি মন বলতে কিছু থাকে, আমি অন্য কোন প্রতিশব্দ পরিভাষা না পেয়ে বলছি। অবশ্য মন আমাদের একই। মনঃপূত যে, তাকে বাদ দিতে গেলেও মনটা খুঁতখুঁত করে। ধরা যাক সেও

এক রকম সূক্ষ্ম শরীর, যার দেহের সংস্কার ছাড়াও আরও কিছু অতিরিক্ত সংস্কৃতি আছে। দেহের সঙ্গে মিশে আছে বলেই আছে। দেহের মধ্যে থেকেই সে দেহাতিরিক্ত। দেহকে বাদ দিয়ে নয়। অশরীরী, বায়ুভূত নিরাশ্রয় সে মনই হোক আর আত্মাই হোক, তার কল্পনা আমি করতে পারিনে। কিন্তু মানুষ মরবার পরে দেহজ পুত্রকন্যা ছাড়াও কাব্যে শিল্পে দর্শনে তার মনের ছাপ রেখে যায়। সেগুলি তার মানসসৃষ্টি। কিন্তু সে সৃষ্টির উপাদান পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তোমরা সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে গড়া ইন্দ্রপুরীকে তুচ্ছ কর।'

সেবা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমরা তুচ্ছ করি ?'

শুভেন্দু বলল, 'স্থূল অর্থে তুচ্ছ কর না। তাকে তোমরা শাড়ি-গয়নায় সাজাও, কেউ বা আলতা সিঁদুরে পানের রসে, কেউ বা লিপস্টিক নেলপলিশে তাকে রাঙাও। তোমরা দেহের আদর করতে জান, কিন্তু কদর জান না।'

সেবা হেসে বলল, 'কদরটা কি রকম? যখন-তখন যেখানে সেখানে পুরুষের কাছে তাকে ধরে দেওয়া ?'

আর একটি বজ্রশেল। আর একটি প্রচণ্ড আঘাত। শুভেন্দুর আর এক মুহূর্তের নিঃশব্দতা।

একটু দম নিয়ে শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, ধরে দেওয়া। তুমি যখন জানবে ধরে দিলেই চিরতরে ধরা দেওয়া হয় না, প্রতি মুহূর্তে এই দেহকে নিয়ে নতুন রহস্যের সৃষ্টি করা যায়; তুমি যখন জানবে রতিজ রোগ আর অবাঞ্ছিত সন্তানের ভয় নেই, বিজ্ঞান তা প্রায় দূর করে এনেছে; তখন তোমার ধরে দিতে আর কোন আপত্তি থাকবে না। তখন তুমি শুধু দেহকে শাড়ি-গয়নায় সাজাবে না, লুকোবে না,—তাকে নিয়ে নতুন কাব্য, দর্শন, মন্দির মসজিদ, নতুন স্থাপত্য গড়বে। মানে, পুরুষকে গড়তে দেবে। মানুষ এক রহস্য থেকে আর এক রহস্যে যাবেই। মিস্টিসিজম তার রক্তে। দেহের রহস্য কিছুতেই নিঃশেষ হবে না। মানুষের প্রতিদিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাকে নতুন নতুন রঙে রসে স্বাদে গন্ধে ভরে তুলবে। 'ন জাতু কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি'—এ যুক্তি আমার পক্ষেরও।'

সেবা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আপনি শুধু একটা বয়সের কথাই বলেছেন। বুড়ো বয়সে মেয়েদের কোথায় থাকে সেই দেহের রহস্য, পুরুষদের কোথায় থাকে সেই দেহের তৃষ্ণা? আর সেই সৃষ্টিশক্তি? রূপের সঙ্গে সঙ্গে চোখের রহস্যও কি মুছে যায় না?'

শুভেন্দু একটু চুপ করে থেকে কি ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার আশা বিজ্ঞান রোগ আর জরাকে একেবারে জয় করতে না পারলেও বহু দূরে কোণঠাসা করে রাখবে। তা সত্ত্বেও জরার দুর্গে মানুষকে বন্দী হতে হবে। তখন, এখনও যা হয় তাই হবে। মা ছেলেকে আদর করে মনের আনন্দের সঙ্গে সব অতৃপ্তির তৃপ্তি পাবে, বাপ ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে এখনও যা পায় তাই পাবে। মনেব কল্পনাকে সে নতুন দেহের মধ্যে মূর্ত্ত দেখবে, চোখ দিয়ে নবযৌবনকে ভোগ করবে, আপন যৌবনকে প্রত্যক্ষ করবে। বুকে টেনে নিয়ে শান্তি পাবে। ঠাকুবদাব বুড়ো হাডে বুকের পাঁজরায় মাঝে মাঝে নাতি-নাতনীর কচি কোমল ত্বকের স্পর্শ একই সঙ্গে পূর্ব আর অপূর্ব সুখানুভূতিব সৃষ্টি কববে—এখনও যেমন করে।'

সেবা বলল, 'তা হলে পথে আসুন। সেটুকু দৈহিক সম্পর্ক তো মনুসংহিতায় অস্বীকার কবে না। তা হলে বড়মামা যা বলেন তাই বলুন। শুধু বুড়ো বয়েসেব জন্যে তুলে না রেখে সম্পর্কেব বৈচিত্র্যকে শুরু থেকে স্বীকার করতে করতে আসুন। নইলে বুড়ো বয়সে যে ভীমরতি ধরবে। দেখেন না কতজনের ধবে? তা হলে বিশেষ ধরনের দেহের সম্পর্ক বিশেষ একজনের জন্যে তুলে বেখে আর সবাইকে অন্যভাবে স্পর্শ করুন। কারও হাতে হাত রাখুন, কাবও পা ছুঁয়ে প্রণাম করুন, কারও মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ —সেও তো দেহ দিয়েই দেহকে স্পর্শ করা। তবু তার ধরন আলাদা। কি মনের দিক থেকে, কি দেহের দিক থেকে সব সম্পর্ককে একাকার করে তুলবেন না।'

শুভেন্দুর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল, সেবা শৈলেন্‌-বাবুর কথাগুলি অনর্গল মুখস্থ বলে যাচ্ছে। ও শুধু স্মৃতিধরী নয়, শ্রুতিধরীও। শৈলেন্দ্রবাবুর জাদু থেকে ওকে মুক্ত কববার জন্য শুভেন্দুর হাত নিশপিশ

করতে লাগল। সেবার তিরস্কারের জবাবে সে বলল, 'একাকার করে তুলতে কেউ পারে না সেবা। তেমন ইচ্ছা কি প্রবৃত্তি তার হয় না। চরম অসংযমও এক জায়গার এসে সীমা মানে। অন্তত জৈবিক নিয়মেও মানে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কারও কারও বেলায় যদি তার ব্যতিক্রম ঘটেই তাতে কিছু এসে-যাবে না। তাতে কেউ কাউকে জেলে দেবে না, হুঁকো বন্ধ করে রাখবে না, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে। কারণ দেহ-সংযোগ সত্ত্বেও স্নেহ শ্রদ্ধা বন্ধুত্বের সম্পর্কেও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কারণ মানুষের পুরো সম্পর্ক শুধু ওইটুকুর ওপব নির্ভব করে না। সে বৈচিত্র আরও নানা দিক থেকে নানাভাবে গড়ে ওঠে।'

সেবা আঁতকে উঠে বলল, 'বলেন কি আপনি! নারী-পুরুষের স্নেহের সম্পর্ক, শ্রদ্ধার সম্পর্ক আব প্রেমেব সম্পর্কের মধ্যে দেহের দিক থেকে কোনও ভেদ থাকবে না? মানুষ কি সেই আদিম বন্য বর্বরতায় ফিরে যাবে?'

হঠাৎ শুভেন্দু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, 'ফিরে যাবে কি সেবা! সেই বন্য বর্ববতাব মধ্যে এখনও সে রয়েছে। সেই অন্ধকার অরণ্য তার মনে। সে দেহেব বাঘেব ভয়ে মনের বনে লুকিয়েছে। আর ভিতর থেকে মনেব বাঘ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বর্বরতার কথা বলছিলে সেবা। হোয়াট্ ইজ ইওব সো-কল্ড সিভিলিজেশন? ইজ ইট এনিথিং বাট স্যাভেজারি সিল্ভারগিল্ট। শুধু যৌনজীবনে কেন? সমাজ-জীবনেব সব স্তরে এই ভণ্ডামি, যা গুণ্ডামির চেয়েও মারাত্মক। সেই গিল্টি খসিয়ে ফেলতে হবে। সেই লুকনো স্যাভেজের হাত পা আর মনের শিকল সব খুলে দিতে হবে, তবেই তাব সভ্য রূপ আমরা দেখতে পাব। এখনও চলছে প্রাক্ সভ্যতার যুগ। গিল্টির বদলে আসল সোনা চাই, সত্যিকারের সোনা।'—বলতে বলতে সেবার দিকে আরও দু পা এগিয়ে এল শুভেন্দু।

কিন্তু সোনা শব্দটি সেবার মনে আর এক স্মৃতি এনে দিয়েছিল। আর এক স্বপ্ন। একই সঙ্গে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন। শুভেন্দুর সঙ্গে স্বর্ণবর্ণ আর একটি পুরুষ এসে মিশে যাচ্ছে। দুজনে মিলে যেন এক হয়ে যাচ্ছে তারা।

সেবা সভয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর দু পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু শুভেন্দু আরও এগিয়ে এসে ততক্ষণে ওর দু কাঁধে দুখানি হাত রেখেছে। আগের বারের মত ঠিক যেন অতখানি বাসনার উত্তাপে নয়—অনেকটা জেদে আর কৌতুকে। শৈলেনবাবুর জাদুমন্ত্র থেকে ওকে মুক্তি দেবার এক জোরালো ইচ্ছায় এতক্ষণ ধরে যা প্রচার করল সেই সংস্কারমুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহে শুভেন্দু সেবার কম্পিত তনুদেহকে স্পর্শ করল। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'রাত হল সেবা। এবার আমাকে ফিরতে হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে—'

সেবা ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আর্তস্বরে বলল, 'না না, আজ নয়, এখানে নয়, এ ঘরে নয়—'

শুভেন্দু হেসে আধা-কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'কেন, তোমার অত ভয় কিসের সেবা?'

সেবা মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'না না না।'

শুভেন্দু তেমনই হেসে বলল, 'ওনলি এ কিস্, এ পার্টিং কিস্, নাথিং মোর নাথিং লেস, মাই ডার্লিং।'

'এ লিটল বিট মোর মাই ফ্রেণ্ড, এ লিটল বিট মোর ইউ ডিজার্ভ।—' দরজায় ও-পাশ থেকে জয়ন্তের গলা শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তরল পানীয়ে ভরতি একটি অতিবৃহৎ কাচের গ্লাস ঝনাৎ করে এসে শুভেন্দুর ডান চোখের ভ্রূর একটু ওপরে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল সেবা, জয়ন্তের দিকে চেয়ে বলল, 'এ কি করলেন জয়ন্তদা? এ কি হল?'

ততক্ষণে জয়ন্ত ঘরে ঢুকেছে। সে গম্ভীর ভাবে শুভেন্দুর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'কিছুই হয় নি। আমার একটি কাচের গ্লাস নষ্ট হয়ে গেল এই যা।'

অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিয়ে শুভেন্দু যে এ বাড়িতে আসবে তা জয়ন্ত অফিসে থাকতেই জেনেছিল। ব্যবস্থাটা তার পছন্দ হয় নি। আবার সেবার দিকে হাত বাড়াচ্ছে কেন শুভেন্দু? বীথির মাথা কি সে যথেষ্ট বিগড়ে দেয় নি? অন্যদিন চৌরঙ্গীতে গিয়ে বারে বসে। আজ তা না করে একটি

বিয়ারের বোতল সঙ্গে নিয়ে বাড়িতেই চলে এসেছিল জয়ন্ত। ড্রয়িং-রুমে সেবা আর শুভেন্দুকে আড়াল থেকে কথা বলতে দেখে সে ঘরে না গিয়ে নিজের ঘরে বসেই সান্ধ্য কর্তব্য শেষ করছিল। এমন সে মাঝে মাঝে করে। মাত্রাটা খুব বেশী বেড়ে গেলে বছরের দু-একদিন মাত্র সে সামান্য মাতলামি করে তখনই বাইরের লোকে টের পায়। না হলে তার মত শান্ত শিষ্ট গম্ভীরস্বভাবের মানুষকে দেখে কেউ বুঝতেও পারে না, সে মদ খেয়েছে।

খানিক বাদে ওরা গিয়ে বীথির ঘরে ঢুকল। তাও নিজের ঘর থেকে দেখতে পেল জয়ন্ত। হরিদাস আর রুক্মিণীকে নিষেধ করে দিল ও, যেন তার কথা সেবাকে না জানায়। তারপর একটি বোতল জয়ন্ত প্রায় শেষ করে আনবার পরেও শুভেন্দু আর সেবা যখন ও-ঘর থেকে বেরোল না, তখন ওরা কোন্ নতুন নেশায় মেতেছে দেখবার জন্যে গ্লাসটি নিয়ে বীথির ঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল জয়ন্ত। না, ওরা দরজা বন্ধ করে বসে নি, একটা পাট শুধু টেনে দেওয়া আর একটা পাট সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি খোলাই আছে। শুভেন্দু সব পারে। এটুকু আড়ালেরও ওর দরকার হয় না, তা জয়ন্ত এর আগের কয়েকটা ঘটনায় লক্ষ্য করেছে। গ্লাস হাতে দোরের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত শুভেন্দুর দার্শনিক বক্তৃতা শুনতে লাগল আর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে আর সহ্য হল না।

গ্লাসটা চুরমার হয়ে মেঝেয় পড়ল আর তার ভিতরের মদ দামী স্যুটটা ভিজিয়ে দিল শুভেন্দুর। একবারের জন্যে জয়ন্তের দিকে সে শুধু দুটি ঘোলাটে চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর সেবার দিকে ফিরে একটু হেসে বলল, 'কিছু ভেবো না।'

কিন্তু শুভেন্দুর কপাল কেটে ততক্ষণে রক্ত বেরিয়েছে। পাতলা একটু কাচও যেন ঢুকে রয়েছে ভিতরে।

সেবা এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, 'দেখি —দেখি!'

শুভেন্দু বলল, 'দেখবার কিছু নেই।'

সেবা ধমক দিয়ে বলল, 'আছে কি না-আছে আমি দেখছি, আপনি বসুন তো।'

তারপর শুভেন্দুর হাত ধরে টেনে জোর করে বসিয়ে দিল খাটের ওপর। আঁচল দিয়ে মুছে দিল কপালের রক্ত।

তার এই শুশ্রূষা দেখে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। সেবার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কটুকণ্ঠে বলল, 'আমার বোধ হয় আর এখানে থাকা উচিত হচ্ছে না সেবা। এতটা যে গড়িয়েছে আমি ভাবতে পারি নি। তা হলে—'

সেবা জয়ন্তের রক্তিম চোখে এই প্রথম ঈর্ষার আবিলতা লক্ষ্য করল। গলার ঝাঁজটাও যেন অতিরিক্ত রকমের বেশী। ক্রুদ্ধ বাবাকে যেদিন ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত ওকে সেদিনও এত বিচলিত দেখায় নি। সেবা একটু হেসে বলল, 'তা হলে কি হত জয়ন্তদা?' কিন্তু জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বলল, 'উঠবেন না। আমি মামীমার ঘর থেকে তুলো আর টিংচার বেঞ্জিন নিয়ে আসি।'

শুভেন্দু বলল, 'তাতে যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের চেয়েও বেশী জ্বলবে সেবা।'

সেবা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে নীরজার ঘরে চলে গেল। তুলো, বেঞ্জিনের শিশি আর সাদা ন্যাকড়া হাতে এ ঘরে ফিরে এসে দেখল, জয়ন্ত ততক্ষণে চলে গেছে।

শুভেন্দু আবার একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু সেবা তা শুনল না। রক্ত মুছে সে শুভেন্দুর কাটা জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করতে লাগল। রূপদক্ষ শুভেন্দু নারীর আর এক মূর্তির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। আর বেশীক্ষণ কোন কিছুর দিকে পলকহীন হয়ে চেয়ে থাকলে সে চোখে জল আসবেই। তা ছাড়া যার চোখ জলে বেশী তার চোখই তাড়াতাড়ি জলে ভরে ওঠে। মনে মনে বুদ্ধিমান বলে শুভেন্দুর যত গর্বই থাকুক, আসলে সেও আবেগপ্রধান, ভাবপ্রবণ মানুষ।

ব্যাণ্ডেজ করতে করতে সেবা মনে মনে ভাবল, জয়ন্তদা যতই রাগ করুন, সে তো রাত-দুপুরে একদিন তাঁরও শুশ্রূষা করেছিল। মদের গন্ধ-ভরা বমি

ধুইয়ে দিয়েছিল মুখ থেকে। আজ না হয় আর একজনের রক্ত মুছে দিচ্ছে। তার মনে হল ক্ষুধার্তের জন্যে, তৃষ্ণার্তের জন্যে, রোগার্তের জন্যে যেমন শুশ্রূষার প্রয়োজন আছে, কামার্তের জন্যেও তেমনই। কাম তো সংসার-সমাজ ছাড়া নয়! সে তো আর উড়ে এসে জুড়ে বসে নি! সে যে মনের কোণে কোণে বাসা বেঁধে আছে। সে বাসার খবর সেবা নিজেও কিছু না রাখে তা তো নয়। সেবার মনে হল, কামের উপভোগের দ্বারা হয়তো কামনার উপশম হয় না, কিন্তু স্নেহ শ্রদ্ধা, প্রীতি, মমতায় তাকে হয়তো কিছুটা কমিয়ে রাখা যায়, ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধারায় ফের তাকে প্রবাহিত করে দেওয়া যায়।

ব্যাণ্ডেজটা শেষ হওয়ার পর শুভেন্দু কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আজ আমার আর একবার হার হল সেবা। জয়ন্তের কাছে নয়। বীথির কাছেও আমি কোন অপরাধ করি নি। সী ইজ নট মাই ম্যারেড ওয়াইফ। তা ছাড়া সেও আমার মত ইনডালজেস ইন প্রমিসকিউটি।

সেবা বলল, 'ও-সব কথা থাক্ শুভেন্দুবাবু।'

শুভেন্দু বলল, 'ভেবো না আমি তার নিন্দা করছি। আমি তারও নিন্দা করছি নে, আমারও নিন্দা করছি নে। এতক্ষণ ধরে তোমাকে যে সব কথা বলেছি, যে মতবাদের ব্যাখ্যা করেছি তাও ফিরিয়ে নিচ্ছি নে। সেগুলো ঠিকই আছে। তার একটি অক্ষরও বদলাবার দরকার বোধ করছি নে। কিন্তু বদলাতে হবে নিজেকে। আমার আচরণের বড় ক্রটি হয়েছে।'

একটু থেমে সেবা কিছু বলে কি না দেখে নিল শুভেন্দু। তার পর ফের বলে চলল, 'আমার আচরণের ক্রটি হয়েছে প্রথমে তোমার কাছে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি দু-দুবার তোমাকে স্পর্শ করেছি। সেই বর্বরতার জন্যে তুমি আমাকে জেলে পাঠাতে পার। আমি মামলা লড়ব না, কাঠখড় পোড়াব না। কাসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দোষ কবুল করব। দ্বিতীয় ক্রটি যা আরও বড় তা আমার নিজের রুচিবোধ আর রূপতত্ত্বের কাছে। এখানে বার বার আমার হার হচ্ছে সেবা। আমি এখনও সত্যিকারের রূপরসিক, শিল্পরসিক হতে পারলাম না। আমি পাথরের নগ্ন নারীমূর্তির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি, কিন্তু রক্তমাংসের রূপময়ীর সামনে পাঁচ মিনিটও পারি নি। তার লাস্য আমাকে চঞ্চল করেছে, তার ঔদাস্য আমাকে আঘাত করেছে। সে তো ঠিক রূপরসিকের স্বভাব নয়। আমি চঞ্চল হব, আমি অচঞ্চল থাকব আমার ইচ্ছামত। আমাকে তো ইচ্ছাময়ীর অধীন হলে চলবে না। না ইচ্ছাময়ী তারার, না কোন ইচ্ছাময়ী তারকার। রূপের সাধনা আমাকে ফের নতুন করে শুরু করতে হবে সেবা। রূপের মধ্যেই যে পরম মঙ্গল তা আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

সেবা আর কোন তর্কে কি আলোচনায় যোগ না দিয়ে বলল, 'আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এক কাপ কফি এনে দেব, খাবেন?'

শুভেন্দু মাথা নেড়ে বলল, 'না না, এ ক্লান্তি কিছু নয়। তা ছাড়া আরও কথা আছে। যে জড়বাদের আমরা উপাসক, আমি আর জয়ন্ত দুই বন্ধুতে মিলে তাকে জড়তাবাদ করে তুলেছি। তা করলে তো চলবে না। আমরা দু দিক থেকে দুই জড়ভরত। ওর হরিণ-শিশু মদ। আর আমার আছ তোমরা হরিণীরা। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের পিছনে ছুটব; কিন্তু চিরদিন—চিরজীবন ছুটব কেন? আর ছুটব না। তোমরা নিজেরা এসে জুটবে। কেউ সঙ্গিনী হবে কর্মে, কেউ শিল্পধর্মে, কেউ বা সম্ভোগে। কিন্তু প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠা যার যার নিজের ক্ষেত্রে। তা হলেই আমি হতে পারব স্বপ্রতিষ্ঠ ক্ষেত্রপতি। এ সাধনাও আমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে। হয়তো একদিনে হবে না, হয়তো আরও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটবে। কিন্তু ত্রুটি দূর করবার জোরালো ইচ্ছা যদি মনের মধ্যে জীইয়ে রাখতে পারি তা হলে বিচ্যুতিকে ভয় কি? দি গ্রেটেস্ট গ্লোরি অব আওয়ার লাইফ লাইজ নট ইন নেভার ফলিং বাট ইন রাইজিং এভরিটাইম উই ফল।'

সেবা চমকে উঠে অবাক হয়ে বলল, 'এ কি, ও কথা আপনি কোথায় পেলেন?'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'শৈলেনবাবু একদিন ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কথাটা নিয়েছি, উপদেশটা নিই নি। কারণ ওঁর রাইজ অ্যাণ্ড ফল-এর সঙ্গে আমার রাইজ অ্যাণ্ড ফল-এর কন্‌সেপশনে-এর মিল নেই। ওঁর

কাছে যে 'ফল'-এর অর্থ নৈতিক পতন, আমার কাছে তা জলপ্রপাত। গুডনাইট সেবা।'

শুভেন্দু ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, দেখল, দোর আগলে বীথি দাঁড়িয়ে আছে। তার জলন্ত চোখ দেখে শুভেন্দু বুঝতে পারল, বীথির জানতে শুনতে বুঝতে আর কিছু বাকি নেই।

বীথি ধরা গলায় শুধু একটি কথা বলতে পারল, 'তুমি এত বড় স্কাউণ্ড্রেল !'

শুভেন্দু এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর কারুণ্যের সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে বলল, 'বীথি, তোমার এই শক্তিশেল বুকে নিয়েই ফিরে চললাম। যদি সময় পাও তো কাল নিজেই তুলে দিয়ে এসো।'

বীথি বলল, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা করবে কে ?'

শুভেন্দু আর তর্ক না করে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে নীরজা সেবাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। তিনি আজও তেমনই গম্ভীরভাবে মহিমাময়ীর বেশে আছেন। আজ আর কলেজের ফাইলে মুখ ঢাকবার তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সেবা রইল মুখ নীচু করে। আজ তো আর সে বাদিনীর কাঠগড়ায় নেই। আংশিক ভাবে আজ সেও আসামী। দায়রা জজ রায় দেওয়ার আগে তার দিকে একবার নির্মম নির্লিপ্ত ভাবে তাকিয়ে নিচ্ছেন।

নীরজা ধীর মৃদু কিন্তু কঠিন স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমি সব শুনেছি সেবা, শুনে দুঃখিত হয়েছি। দেখ, আমরা অনেক কিছুই মানি নে, আবার অনেক কিছুই মানি। ডিসেন্সি, ডেকোরাম বলে দুটো শব্দ আছে। তার মানে যদি না জান ডিক্সনারি খুলে দেখে নিও। তোমার বড়মামার কাছেও জিজ্ঞেস করতে পার। বীথির ঘরে বসে এক বাড়ি লোকের সামনে তুমি যে কাণ্ডটা করলে, সাধারণ একজন ঝিয়েও তা করতে লজ্জা পেত।'

আত্মসমর্থনে সেবার অনেক কথাই বলবার ছিল। দোষটা যে চোদ্দ আনা শুভেন্দুর, তার দু আনা, আর সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে সে যে আহত

শুভেন্দুর সেবা করেছে সে কথা মামীমাকে বুঝিয়ে বলতে পারত সেবা। কিন্তু ইচ্ছা করেই বলল না। জেদে অভিমানে চুপ করে রইল। কিছুতেই চোখে জলের বিন্দু জমতে দিল না। আজ আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েও বাদিনীর তেজ তার একেবারে মরে নি। সেবা শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল যে, এঁদের উদারতা সহনশীলতা প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দৌড় তা হলে ওই নিজেদেব স্বার্থের মসজিদ পর্যন্ত। তাব বেশী এক পাও কি এঁরা অগ্রসর হয়েছেন? তা হলে তাদেব সেই গ্রামের সমাজের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ কোথায়?

অভিযোগগুলোর কোন জবাব না দিয়ে সেবা শুধু বলল, 'মামীমা, কাল আমি নারকেলডাঙায় চলে যেতে চাই।'

নীরজা বললেন, 'বেশ তো, যেয়ো।'

আজ তিনি আর খোলা ড্রেন, মশাব রাজত্ব আব ম্যালেরিয়াব ভয় দেখিয়ে ধমক দিলেন না।

নীরজার পরে তাকে ডেকে পাঠালেন শৈলেন্দ্রনাথ। সেবা তাঁব সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাঁর মুখ আজ একটু গম্ভীব। ঘটনাটা পল্লবিত হয়ে বোধ হয় তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। সেবা তাই আন্দাজ করল।

শৈলেন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে, কি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সেবা, তোমাকে আমি জানাশোনা মেয়েদের একটা হস্টেলে রাখব বলে ঠিক কবেছি। মনে হচ্ছে এখানে তোমার আর না থাকাই ভাল। পবিবেশের প্রভাব এড়ানো তো সহজসাধ্য নয়। হেরিডিটিব গুরুত্ব বেশী, না, এনভিবনমেণ্টের চাপ বেশী, সে তর্কের আজও মীমাংসা হয় নি। কিন্তু এনভিবনমেণ্টের প্রভাব যে প্রবল তা অস্বীকাব করবার জো নেই।'

সেবা এই দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় যোগ না দিয়ে বলল, 'বড়মামা, আমি নারকেলডাঙায় আমার এক পিসীমার কাছে ক'দিন গিয়ে থাকব ভেবেছি। তিনি অনেক দিন ধরেই যেতে বলছেন। বুড়ো মানুষ। কবে আছেন কবে নেই, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপরে একটা হস্টেল-টস্টেল

না হয় ঠিক করে নেওয়া যাবে। একটা কাজকর্ম না জুটিয়ে হস্টেলে যাবই বা কি করে?

শৈলেন্দ্রনাথ সেবার এই প্রচ্ছন্ন আঘাত আর অবাধ্যতায় ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু মনের ক্ষোভ কিছুতেই প্রকাশ করলেন না। চাকরি তো তোমার একটা জুটেছে—কথাটা মুখে এলেও কিছুতেই তাকে মুখ থেকে বেরোতে দিলেন না। অতটা অশোভন রুচির মানুষ তিনি নন। তিনি স্মিতমুখে শান্তস্বরে বললেন, 'বেশ, তোমার যা ভাল লাগে তাই কোরো।'

সেবা চলে আসছিল। শৈলেন্দ্রনাথ তাকে ফের ডেকে বললেন, 'ভাল কথা, তোমার একটা চিঠি বিকেল থেকে এখানে পড়ে আছে সেবা। আমার কেয়ারে এসেছে তাই ওরা কেউ এই টেবিলেই রেখে গেছে। তোমাকে দেওয়ার আর সময় পায় নি। নিয়ে যাও চিঠিটা।'

হাত পেতে চিঠিটা নিল সেবা। খামের চিঠি। স্ট্যাম্পের অশোকস্তম্ভের ওপর ডাকঘরের গোটা দুই সীল। নাম বোঝা যায় না। ঠিকানাটা কাঁচা ইংরেজী অক্ষরে লেখা। অচেনা হাত। এমন লেখা এর আগে সেবা দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

চিঠিখানা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল সেবা। নিজের ঘর! আজ বোধ হয় বীথিদি তাকে এ ঘর থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। অর্ধাংশ তো ভাল, সূচ্যগ্রমেদিনী দিতেও সে বোধ হয় আর রাজী নয়। সেবা ঘরে ঢুকলেও বীথিকা তার সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলল না। পরম অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে রইল। সেবা মনে মনে হাসল। তাকে যত অবজ্ঞাই করুক, বীথি আজ পরাজিতা, সেবা বিজয়িনী। অন্তত এই নাটকের একটি অঙ্কে নায়িকার রোল তার আর নেই। সে উপনায়িকায় নেমে এসেছে।

চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে দিল সেবা। খুললও না, পড়লও না। তার সমস্ত মন ছেয়ে আবার নেমে এসেছে গাঢ় ঘন অন্তহীন অন্ধকার। পৃথিবীর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, অপ্রীতি আর হিংস্রতার ঝড়। সে ঝড়ে সব উড়ে যাচ্ছে।

কে লিখেছে তাকে ও-চিঠি? বোধ হয় মা-ই লিখেছে। আর এক দফা

অভাব-অনটনের ফিরিস্তি। একখানা লিখে ঠিক থাকতে পারে নি। পিঠ পিঠ আর একখানা পাঠিয়েছে। এমন অভ্যাস তার আছে। তার পর হয়েতো পাড়ার কোন স্কুলে-পড়া ছেলেকে দিয়ে ঠিকানাটা লিখিয়েছে। না, কি বড়মামাই লিখেছেন ও-চিঠি? কূট চিন্তা কূট প্রশ্নের ঝকঝকে এক বল্লমের ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল সেবার মনে। একটি নয়, অনেকগুলি। ডাকাতির রাত্রে এক পলকের জন্যে দেখেছিল সেই সব শাণিত অস্ত্র। সেবার মনে হল তাও হতে পারে। তিনিও লিখতে পারেন ও-চিঠি। লিখে হয়তো ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছেন। বাক্সের বাইরে ফেলে দিতে মন সরে নি। এও হয়তো আর এক ধরনের নিয়োগপত্র, কিংবা কোন সৎ হস্টেলে যাওয়ার আমন্ত্রণ। কিছুই বিচিত্র নয় সংসারে। চিঠিখানা ছুঁয়েও দেখল না সেবা।

সেদিন বীথি আর সেবা দুজনের কেউ খেল না। রুক্মিণী আর হরিদাস এসে অনেক সাধাসাধি করে গেল, কেউ উঠল না, চুপ করে শুয়ে রইল যে যার বিছানায়। খানিক বাদে সেবা বলল, 'বীথিদি, কথা বন্ধ করার আগে আমার কথাগুলি ভাল করে শোন।'

বীথি মুখ ফেরাল না। তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থেকে বলল, 'শোনবার আর কিছু নেই সেবা। আমি সবই বুঝি। বলতে চাই নে দোষ কেবল তোর। শুভেন্দু এক ডাকাত। কিন্তু ডাকাতের হাতে ধরা দেবার সাধ তো তোর আজ নতুন নয়।'

সেবা স্তব্ধ হয়ে রইল। এ অপবাদ তো গাঁয়ের লোকেও তাকে দিয়েছে। তারাও বলেছে, ডাকাতিটা সাজানো। সেবা নিজেই ইচ্ছা করে বেরিয়ে গিয়েছিল আতিকরের সঙ্গে। আসামী পক্ষের উকিলরাও প্রাণপণে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে। তা হলে সেবার সেই বালবিধবা কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে এই স্বামী-ত্যাগিনী শহুরে মেয়েটির তফাত কি? তারা বাংলায় কথা বলে, বীথিদি ইংরেজীতে। সেবার মনে হল, এরা মুখে যে যাই বলুক, পলিগেমির মত মনোগেমির সংস্কারও এদের রক্তে। এরা নিজেদের ব্যাভিচার সমর্থন করে, অন্যের ব্যাভিচার সহ্য করে না।

পাশাপাশি দুখানা খাট। মাঝখানে হাত দেড়েক-দুই মাত্র ব্যবধান।

যেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর চেয়েও বেশী। এতদিন ঘুমোবার আগে বীথি তার সঙ্গে কত কথা বলেছে! কত শিল্পের কথা, সাহিত্যের কথা, নাটক আর নাট্যাভিনয়ের তত্ত্ব আর কলাকৌশল; তার সহকর্মী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রূপগুণ স্বভাবচরিত্রের বিবরণ, কলকাতার নাগরিক অভিজাত সমাজের হালচাল নিয়ে কত সরস আলেচনা করেছে! কিন্তু আজ প্রীতি আর সৌখ্যের সেই রসসমুদ্র একেবারে শুকনো। তাদের চণ্ডীপুরের সেই সংকীর্ণ খালটি যেমন চৈত্র-বৈশাখে শুকনো খটখট করে তেমনই।

অনেক রাত পর্যন্ত সেবার ঘুম এল না। মাঝে মাঝে তন্দ্রার মত এলেও বর্শা বল্লম মশাল মুখোশের দৌরাত্ম্যে বার বার তা ভেঙে যেতে লাগল। শেষবারে যখন ঘুম ভাঙল তখন তরল অন্ধকার গলে গলে নিঃশেষ হয়েছে, ভোরের আলো এসেছে ঘরে। পরিষ্কার আলো নয়। তার সঙ্গে এখনও অস্পষ্ট আঁধারের ছায়া জড়ানো। বীথির ঘুম এখনও ভাঙে নি। ঘুমের মধ্যেই সে যেন কখন পাশ ফিরে শুয়েছে। এবার কাত-করা মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছে তার। কিন্তু কী সে মুখের শ্রী! অমনিতে বীথিকে রূপসী না বললেও সুশ্রী বলতে হয়। শিল্পনৈপুণ্যের একটি পর্যায়ে সে উন্নীত হয়েছে, তার মুখ সেই শিল্পীর মুখ। সে মুখ শুধু সুর্মা স্নো লিপস্টিকে সাজানো নয়, সে মুখ শিক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যে মাজিত, শিল্পভাবনায় কমনীয়। কিন্তু আজ এ কী শ্রী হয়েছে সেই মুখের! চোখের কোলে যে কালি তা কি শুধু সুর্মার? ঠোঁট দুটি যে শুকনো আর বিবর্ণ তা কি লিপস্টীক ধুয়ে শোয় নি বলে? কাল যেমন রাগ করে খায় নি, তেমনই শোয়ার আগে স্নানও সারে নি বীথি। ওর মুখের যে ক্লান্তি, সারা রাত ঘুমোবার পরেও ওর সারা মুখে যে শ্রান্তি লেগে রয়েছে তা কি শুধু নায় নি খায় নি বলে! তা কি শুধু বাইরের সামান্য অপরিচ্ছন্নতার জন্যে? সেবার মনে হল, তা নয়, তা নয়। হয়তো বীথিদিও তার মতোই সারা রাত ধরে বল্লম বর্শা আর মুখোশের স্বপ্ন দেখেছে। মশালের আগুনে বার বার তারও মনের শান্তি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেবার মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে এই বীথিই তার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। মায়ের

মত, মায়ের পেটের বোনের মত বসেছিল তার শিয়রে। যে রাত্রে সে ঘুমোতে পারে নি, সে রাত সেও জেগে কাটিয়েছিল। কী মনে হল সেবার। আস্তে আস্তে মেঝের উপর হাঁটু পেতে বসল। ফের এক পলক তাকিয়ে রইল বীথির দিকে। তারপর আস্তে—খুব আস্তে হাত রাখল ওর কপালে, বীথি যেমন করে সেদিন রেখেছিল। হাত রেখে সেবা চুপ করে রইল। তাতেও বীথির ঘুম ভাঙল না। বরং সেই ঘুমের ঘোরে হাতখানা তুলে নিয়ে সে নিজের বুকের ওপর রাখল। তারপর অস্ফুট আর্তনাদের সুরে বলল, 'শুভো, শুভো, তুমি এ কী করলে?'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, শিউরে উঠল সেবা। কিন্তু হাত সরিয়ে নিতে পারল না। হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না। বীথিদির মুখে শুভেন্দুর নাম এমন করে উচ্চারিত হতে, এমন করে ধ্বনিত হতে কোনদিন তো শোনে নি সেবা। তার মনেও ঈর্ষার এক তীব্র খোঁচা লাগল। কিন্তু পর-মুহূর্তে নিজের ঈর্ষার আগুনে আর একটি দগ্ধ হৃদয়কে অতি স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করল। ঈর্ষা অসূয়া আর ঘৃণার অস্বচ্ছ মুকুরে প্রেমের পবিত্র ছবি কি চিরকাল এমনি করে ফুটে ফুটে উঠবে?

হঠাৎ কী খেয়াল হল, কিসের আবেগে তাড়িত হল সেবা বলা সহজ নয়। সে নিজের মুখখানা বীথিব মুখের আরও কাছে—আরও কাছে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর কপালে নয়, চোখের পাতায় নয়, চিবুকে নয়, বীথির সেই বিবর্ণ বিশীর্ণ দুই ঠোঁটে দীর্ঘ—সুদীর্ঘ এক চুম্বন করল। যে চুম্বন শুভেন্দু চেয়ে চেয়ে পায় নি, বীথি তা অযাচিত ভাবে পেল।

দেহের সঙ্গে দেহের সংযোগ, দেহের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক তা কি শুধু যৌন আবেগ? সেবার মনে হল, তা নয়, তা নয়। আরও'বেগ আছে, আরও আবেগ আছে। তাও তীব্র তীক্ষ্ণ দুর্বার। কামনাধারার মত করুণাধারা, গঙ্গাধারার পাশে যমুনাধারা।

আর সেই চুম্বনস্পর্শে, স্পর্শসুখে থরথর করে কেঁপে উঠল বীথিকা, বিছানার ওপর উঠে বসল। সামনে সেবাকে দেখে প্রথমে একটু বিস্মিত নিরাশ কুপিত হল বীথি। কিন্তু তাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না

দিয়েই সেবা বীথিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। তার পর ওর সেই সুগঠিত সুপুষ্ট বুকে মাথা গুঁজে, মুখ গুঁজে ডাকতে লাগল, 'বীথিদি, বীথিদি, বীথিদি!'

চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

অশ্রুর দুটি ধারা দুই পর্বতচূড়ার কন্দরে কন্দরে যেন নিজেদের উৎসমুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বীথি আস্তে আস্তে হাত রাখল সেবার পিঠে। ধরাগলায় বলল, 'কি হল রে, কি হল তোর? হিস্টিরিয়ায় পেয়ে বসল নাকি? আচ্ছা মেয়ে যা হোক! পচা ভ্যাপসা সেন্টিমেণ্টে ভর্তি!'

এই মুহূর্তে ওদের মাঝখানে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান আর নেই। একই অশ্রু-নদীতে ওরা আকণ্ঠ মগ্ন। পাশাপাশি ভেসে আছে শুধু দুখানি মুখ। একটি শ্বেতপদ্ম, আর একটি রক্তপদ্ম।

১২

হাত মুখ ধুয়ে এসে এবার চিঠিখানা খুলল সেবা। কে আর লিখবে! মা-ই বোধহয় লিখেছে। বাবার সঙ্গে, ঠাকুরমার সঙ্গে ঝগড়া করে মনের দুঃখে একই দিনে লিখেছে দ্বিতীয় চিঠি। আহা, সেবার মায়ের দুঃখ কি কম। ধর্ষিতা মেয়ের মা। ঝগড়া-ঝাঁটি লাগলে শুধু পাড়াপড়শীর কাছে নয়, নিজের শাশুড়ী-স্বামীর কাছেও কত গঞ্জনা তাকে শুনতে হয়। তার প্রশ্রয়েই নাকি অমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুরপনেয় কালি লেগেছে কুলে।

কিন্তু চিঠি খুলে সেবা অবাক হয়ে গেল। মার হাতের চিঠি তো নয়! মায়ের চেয়েও কাঁচা আঁকাবাঁকা বড় বড় হরফে লেখা। তার চেয়েও বেশী বানান ভুলে, ভাষার ভুলে ভরতি। সে সব ভুল মনে মনে শুধরে নিতে নিতে চিঠিখানা পড়তে লাগল সেবা :

"মা, তোমার কাছে মুখ দেখাবার আমার আর জো নেই। কিন্তু বড় দুঃখে পড়ে, বড় কষ্টে, নিতান্তই না থাকতে পেরে এই চিঠি লিখছি। আতিকর আজ দু মাস হল জেলের হাসপাতালে। রক্ত-আমাশা, যক্ষা আরও নাকি কি কি সব রোগ আছে! ডাক্তাররাই বলতে পাবে। তারাই বলে দিয়েছে, ও আর বাঁচবে না। আমার কাছে বলে নি, আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে বলেছে। এই শহরে তার বাসায় এসে আমি উঠেছি। রোজ সকালে বিকালে যাই। তারা যেতে দেয়। আমার সেই ভাই মানী লোক। তার জন্য দয়াধর্ম সবাই করে। যা হাল হয়েছে। এ-বেলা গিয়ে ভাবি, ও-বেলা হয়তো আর আসতে হবে না। কিচ্ছু খেতে পারে না। কত কী নিয়ে যাই! ওর খাওয়ার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু কিচ্ছু ছোঁয় না। আমি রোজ পুছ করি—সোনা, তোর কী খেতে সাধ্ যায় বল? আমি তাই এনে দেব। সে কথা কয় না মা, চুপ করে থাকে। আমি বলি —বাজান, তুই কথা বল, কথা বল। আমার কাছে আজ আর তোর কোন

শরম নেই। যে গুণাহ্ তুই করেছিস তা তো সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে চললি। এর পর,খোদার দরবারে তোর যে সাজাই হোক, আমার কাছে তুই তো তুই ই। আমার সোনা, আমার মানিক! তোর কি কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে? ও তবু কথা বলে না। শরমে মুখ আরও নামায়। ওর কি আর মুখ তোলবার জো আছে? আমি একজন একজন করে আত্মীয়কুটুমের নাম করি। ও কেবল ঘাড় নাড়ে। আমি বলি—আমার কলজে যে ফেটে যায় বাজান, তুই একবার মুখ ফুটে বল। সে যদি আসমানের চাঁদ হয় আমি তাকেও তোর কাছে পেড়ে এনে দেব।

সে চাঁদ যে কে, তা আর মুখে বলে কি হবে? সে আসমান যে খোদার আসমানের চেয়েও দূরে, সে চাঁদ যে ঈদের চাঁদের চেয়েও দামী। আমার সাধ্য কি যে তাকে পেড়ে আনি! তবু তাকে রোজ বলি—এনে দেব, এনে দেব। ছেলেবেলায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে কাঁদত। তখনও তাকে বলতাম—এনে দেব, এনে দেব। আজ তার যাবার বেলায়ও তাই বলি।

তুমি কি আমার মুখ রাখবে মা? ইতি

চিরদুঃখিনী
সাকিনা বেগম।

চিঠিখানা একবার শেষ করে আবার পড়তে আরম্ভ করল সেবা। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শেষ করা হল না। তার আগেই চোখের জলে অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে।